শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
দোলপূর্ণিমা : ১৩৫৭

মুদ্রাকর :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
মুদ্রণ ভারতী (প্রাঃ) লিমিটেড
২ রামনাথ বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৯

নত্বা বদামি তব পাদসহস্রপত্র-
মাজ্ঞা বিভো ভবতু তে মম তত্র শক্তিঃ।
ভুয়াদ্ যথা তব কথামৃতসারপূর্ণা
বাণী বরেণ্য নৃহরে করুণামৃতাব্ধে॥

—মুরারি-গুপ্ত : কড়চা ২।১॥

অবতরণিকা

বিষয়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকটলীলা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। বাঙ্গালীর অশেষ সৌভাগ্যোদয়ে আধ্যাত্মিক জগতের এই দুই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বাঙ্গলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, প্রায় সাড়েতিন শত বৎসরের ব্যবধানে; এবং বাঙ্গলাকেই সমধিক ভাসাইয়াছিলেন, ও চিরকাল ভাসাইতে থাকিবেন, তাঁহাদের জ্ঞানগঙ্গা ও প্রেমযমুনার প্লাবনে। বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস ইঁহাদের ভাবধারা-স্পন্দনে মুখরিত, বাঙ্গলার প্রাণ ইঁহাদের প্রাণ-প্রবাহে সঞ্জীবিত। বাঙ্গলার ধর্ম, ধর্মমূলক সংস্কৃতি ও সেই সংস্কৃতির বাহন ভাষা—সমস্তই ইঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত। সর্বোপরি ইঁহাদের পদরজঃ ধারণ করিয়া বঙ্গভূমি আজ বিশ্ববাসীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত।

এই দুই 'সবোত্তম নরলীলা' সর্বাংশে এক নহে, সর্বাংশে এক হইতে পারেও না। কারণ, বৈচিত্র্যই লীলার ধর্ম। আবার রঙ্গমঞ্চ প্রায় এক হইলেও যুগ-প্রয়োজন ও পারিপার্শ্বিক এক ও অভিন্ন নহে। তথাপি সমূহ বৈচিত্র্যের পশ্চাতে, অভিনীত প্রায় সকল অঙ্কের পটভূমিতে, সাদৃশ্যই যে অতিমাত্রায় বর্তমান তাহা ভাবুক দ্রষ্টা সহজেই অনুভব করিতে পারেন। এই গ্রন্থ বিভিন্ন অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে সেই সাদৃশ্য দেখাইবার একটা স্থূল ও প্রাথমিক প্রয়াস।

প্রয়োজন

এই প্রয়াস সফল হইলে, দুই মূল অভিনেতার অভিন্নব্যক্তিত্ব সাধারণ দ্রষ্টার চক্ষেও প্রকট হইয়া পড়িবে। তাঁহাদের অভিন্ন রূপ সমগ্রভাবে ও

নানা দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার ও সেই উপলব্ধির উপরে জাতীয় অধ্যাত্ম-জীবন প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি ; এবং বাহ্য ও আন্তর জগতের ঘটনাবলী অনুধাবন করিয়া, উহার সময়ও উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পর হইতে সকল ধর্মমতেই যেন একটা জাগরণ আসিয়াছে। যে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব ভারতবর্ষে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নূতন প্রাণস্পন্দনে সজীব হইয়া নব অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছে।

এই সজীবতা দুইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে : প্রথমতঃ বৈষ্ণব সাধনাকে সহজিয়া সাধনার প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা দ্বারা ; দ্বিতীয়তঃ বৈষ্ণব সাহিত্যের ব্যাপক আলোচনা দ্বারা। ঐ আলোচনা একদিকে যেমন শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত 'অকৈতব' প্রেমধর্মে শিক্ষিত জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, তেমনি অপরদিকে, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির ফলে যে সব সত্যের আংশিক বিলোপ বা বিকৃতি ঘটিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার বা সংশোধন করিবার প্রয়াস জাগ্রত করিয়াছে।

এইভাবে সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা একশ্রেণীর লোকের বিরক্তির কারণ হইয়াছে—তাঁহারা সমালোচনামাত্রেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা উদারচেতা ও সত্যসন্ধ তাঁহারা নিজেদের ইষ্ট নিষ্ঠা অব্যাহত রাখিয়া সত্যনির্ণয়ে আন্তরিক উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্মৎসরচিত্তে শ্রীচৈতন্য-লীলাগ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা শ্রীচৈতন্যজীবনীর কোন কোন অঙ্গ বৈষ্ণব সাহিত্যে উপযুক্ত মর্যাদা পায় নাই দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

অপরদিকে, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে চাহিলেও, সকলেই যে তাঁহার উদার শিক্ষা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছেন, কিংবা তাঁহাদের ভিতর কোন কোন বিষয়ে গোঁড়ামি প্রবেশের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, একথা জোর করিয়া বলা যায় না।

বাঙ্গলাদেশে শাক্ত-বৈষ্ণবাদি প্রায় সকল মতের উপাসকই বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহাদিগকে মোটামুটি শ্রীচৈতন্যের বা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুগামী বলা যাইতে পারে। কেননা দেখা যায়,—কেহ কেহ সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞানে জ্ঞাতসারে ইঁহাদের উপদেশ ও সাধনপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন; কেহ কেহ নিজেদের অজ্ঞাতসারে, কিংবা বাহ্যতঃ ইঁহাদিগকে অস্বীকার করিয়াও, ইঁহাদের ভাব ও শিক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন; আর অধিকাংশ উপাসকই ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে ইঁহাদিগকেই উপাস্যের আসনে বসাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

শাক্ত-বৈষ্ণবাদির পরস্পরকে জানিবার বুঝিবার পক্ষে যে-সব বাধা বিদ্যমান ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা বহুপূর্বেই অন্তর্জগতে উহাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া রাখিয়াছে। ফলে বাহিরেও, আমরা দেখিতে পাইতেছি, তদীয় শিক্ষাকে অবলম্বন করিয়া সাম্প্রদায়িকমনোবৃত্তিশূন্য এক উদার মানব-সমাজ ক্রমশঃ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সুতরাং এই সময়ে এই দুই মহাপুরুষের—আমাদের নিকটতম শ্রীভগবানের এই দুই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশের —জীবনী ও উপদেশাদির তুলনামূলক আলোচনা সকলের, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পক্ষে কল্যাণকর হইবার কথা।

অবলম্বন

এই আলোচনায় শ্রীচৈতন্য-সাহিত্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যের প্রামাণিক গ্রন্থাবলীই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। অধিকাংশ স্থলে এই দুই সাহিত্য হইতে স্থলবিশেষ উদ্ধার বা উহার সারাংশমাত্র সঙ্কলন করা হইয়াছে; কল্পনার কিছুমাত্র আশ্রয় লওয়া হয় নাই। যেখানে বর্ণনামাত্রের উদ্ধার বা সঙ্কলন উদ্দেশ্যসিদ্ধির যথেষ্ট অনুকূল নহে, সেখানে প্রয়োজনানুরূপ বিচার বিশ্লেষণও করিতে হইয়াছে। নিরপেক্ষ ব্যক্তি উহাতে সত্যনির্ণয়ের চেষ্টামাত্র দেখিতে পাইবেন।

কোন কোন গুরুতর বিষয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষানুভূতি-জনিত উক্তি ধ্রুবতারার ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীচৈতন্যের শক্তি-আরাধনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, সন্দেহশীল বর্তমান যুগের খরদৃষ্টির সম্মুখে যাপিত এবং সম্ভাব্য সকল পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী প্রোজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় পূর্বগ অবতার-মহাপুরুষগণের জীবন-লীলার বহু নিগূঢ় ও বিস্মৃতপ্রায় অংশে নূতন আলোকপাত করিয়াছে।

স্থান-সংক্ষেপ করিবার জন্য গ্রন্থমধ্যে বহুবার উল্লিখিত পুস্তকসমূহের নাম অনেকস্থলে একাক্ষরে নির্দেশ করা হইয়াছে। যথা:

চ = শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।
ভা = শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।
ম = শ্রীশ্রীচৈতন্য-মঙ্গল।
মু = মুরারি-গুপ্তের কড়চা।
ত = শ্রীগৌরপদ-তরঙ্গিণী।
ক = শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।
পুঁ = শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি।
লী = শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ।

লীলাপ্রসঙ্গের খণ্ডসমূহকে ১ গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২ গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩ সাধকভাব, ৪ পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ৫ দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ—এই ক্রম অনুসারে ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই গ্রন্থ—'শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ'—ইতঃপূর্বে 'বাঙ্গলার দুই ঠাকুর' নামে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত নামটির সমর্থনে তখন লিখিত হইয়াছিল :

"শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে 'রামকৃষ্ণ' নামের পরিবর্তে 'ঠাকুর' শব্দের এবং শ্রীচৈতন্য-সাহিত্যে 'চৈতন্য' নামের পরিবর্তে 'মহাপ্রভু' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থমধ্যে আমরাও শব্দ দুইটির ঐরূপ প্রয়োগ করিয়াছি। তাহা হইলেও গ্রন্থখানির 'বাঙ্গলার দুই ঠাকুর' নামকরণ অসমীচীন হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই।···চৈতন্য-নামের স্থলে ঠাকুর-শব্দের প্রয়োগ একেবারে দুর্লভ নহে। যথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে :

ক্ষণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ২।১৮
উঠি দেখে ঠাকুর —অদ্বৈত পদতলে। ২।১৯
মদ্যপানে মত্ত-সব ঠাকুরে দেখিয়া।
হরি হরি বোলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ২।২১
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই। ২।২৪"

নানা কারণে নাম-পরিবর্তন করিতে হইল। শ্রীভগবানের নামের গুণে গ্রন্থের গৌরব বাড়িবে।

সূচী

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট



শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম অধ্যায়

বাল্য ও কৈশোরের কথা

নাম-সাদৃশ্য

শ্রীচৈতন্যের প্রথম জীবনের প্রসিদ্ধ নাম শ্রীবিশ্বম্ভর, ডাক নাম নিমাই। তাঁহার দেহকান্তি সুগৌর ছিল বলিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গও বলা হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃদত্ত নাম শ্রীগদাধর, ডাক নাম গদাই। তাঁহার দেহ-কান্তিও সুগৌর ছিল ; সাধনান্তে সেই কান্তি ঈষৎ ম্লান হইয়া যায় এবং বর্ণের জন্য তাঁহার কোন নাম হয় নাই।

বিশ্বম্ভর ও গদাধর উভয় নামই সমার্থক—উভয় নামেই পালনকর্তা শ্রীনারায়ণকে বুঝায়। বিশ্বম্ভর নাম রাখিবার কালে পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিলা নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম। [ভা ১।৩]

গদাধর নাম রাখিবার কালে পিতা শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গয়াধামে নিজের স্বপ্নকথা স্মরণ করিয়াছিলেন। বিশ্বভর্তা শ্রীগদাধর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ঃ

পুত্র হয়ে জনমিব তোমার আগারে। [পুঁ]

নারীগণের আকর্ষণ

নিমাইয়ের রূপলাবণ্য সকলকেই, বিশেষভাবে প্রতিবেশিনীগণকে, আকৃষ্ট করিয়াছিল। গৃহকর্মে অবসর পাইলেই শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শিশুপুত্র নিমাইকে তাঁহারা কোলে করিতেন। আর—

যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে।
দেবের দুর্লভ কোলে করে নারীগণে॥ [ভা ১।৩]

গদাইয়ের আকর্ষণ-শক্তি তদপেক্ষা কম ছিল না। পাড়ার রমণীগণের তো কথাই নাই, পার্শ্ববর্তী গ্রামের আত্মীয়াগণও পূর্বাপেক্ষা ঘনঘন খুদি-রামের কুটীরে আসিতেন। প্রতিবেশিনীগণ শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীকে বলিতেন, 'তোমার ছেলেটিকে সর্বদা দেখতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল, রোজই আসতে হয়।' [লী ৪।৬]

কেমন এ ছেলে দেখে জীবন জুড়ায়।
শুধু অঙ্গ তবু যেন মণিরত্ন গায়॥ [পুঁ]

শ্রীবিশ্বম্ভর ও শ্রীগদাধর উভয়েরই কৈশোরকাল বিদ্যাশিক্ষা ও বিবিধ বালচাপল্যে মধুর। তবে নিমাইয়ে চঞ্চলতার পরাকাষ্ঠা, কিন্তু গদাই অপেক্ষাকৃত শান্ত। সেই ঈষৎচঞ্চল ও অতিচঞ্চল কৈশোর-সুষমা রেখা-বৈচিত্র্যে ও বর্ণখেলায় আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে ততটা বিভিন্ন নহে। স্থানে স্থানে সাদৃশ্য সহজ চোখেই ধরা পড়িয়া যায়। দুইএকটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক।

স্নানের ঘাটে ক্রীড়া ও মেয়েদের অনুযোগ

নবদ্বীপের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই গঙ্গায় স্নানাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। চপল নিমাই তাঁহারই মত চপলমতি সঙ্গীদিগকে লইয়া প্রহরাধিক কাল ঘাটে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সাঁতার কাটিয়া পায়ে

জল ছিটাইয়া, বা অন্য নানা বুদ্ধিকৌশলে, প্রায় সকলকেই অল্পবিস্তর বিব্রত করিয়া তুলেন। দিনের পর দিন এইরূপে বিব্রত হইয়া প্রতিবেশিনী বালিকারা একদিন শ্রীমতী শচী দেবীর কাছে অনুযোগ করিয়া বলিল :

শুন ঠাকুরাণি! নিজ পুত্রের করণ।
বসন করয়ে চুরি, বোলে বড় মন্দ।
উত্তর করিলে জল দেয়, করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুলফল।
ছড়াইয়া ফেলে, বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল।
কেহো বোলে—মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।
কেহো বোলে—মোরে চাহে বিভা করিবারে॥
প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার? [ভা ১।৪]

কামারপুকুর-গ্রামের হালদারপুকুর নামক বৃহৎ পুষ্করিণীতে পল্লীর সকলেই স্নানাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। পুকুরে দুইটি ঘাট; একটি পুরুষ-দিগের ও অপরটি স্ত্রীলোকদিগের জন্য নির্দিষ্ট। চপল গদাই তরুণবয়স্ক ছেলেদিগকে সঙ্গে লইয়া কখনো এঘাটে কখনো ওঘাটে সাঁতার কাটিয়া বেড়ান। কখনো বা উল্লম্ফনাদি দ্বারা বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন। তাহাতে বয়স্কা নারীদের বড়ই অসুবিধা হয়—তাঁহাদের গায়ে জলের ছিটা লাগে ও নিশ্চিন্তমনে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে পারেন না। জনৈকা একদিন বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—তোরা এঘাটে কী করতে

আসিস ? পুরুষদের ঘাটে যেতে পারিস না ? এঘাটে মেয়েরা স্নান করে কাপড় ছাড়ে—জানিস না, এসময়ে মেয়েদের দেখতে নাই ? গদাই বলিলেন, কেন দেখতে নাই ? উত্তরে স্ত্রীলোকটি বালকের বুঝিবার মত কিছু না বলিয়া কেবল তিরস্কারই করিয়া গেলেন।

গদাইয়ের জিজ্ঞাসাবৃত্তি তাহাতে না দমিয়া আরও প্রবল হইল। ঘটনার তিনদিন পরে ঐ স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে, পরশু চারজনকে দেখেচি, কাল ছ'জনকে, আজ আটজনকে—কৈ, আমার কিছুই তো হল না ? স্ত্রীলোকটি চন্দ্রাদেবীর নিকট আসিয়া হাসিতে হাসিতে সেকথা বলিয়া দিলেন।

অবসর কালে মা ছেলেকে বুঝাইলেন : ওতে তোমার কিছু হয় না বাবা, কিন্তু মেয়েরা তাতে অপমান বোধ করেন। তারা যে আমারই মতন, তাদের অপমান কল্লে আমাকেই অপমান করা হয়। তাদের মনে ও আমার মনে ব্যথা দেওয়া কি ভাল ? বালক বুঝিয়া গেলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও ঐরূপ করিলেন না।

শ্রুতিধরত্ব-গুণে শাস্ত্রাদি আয়ত্তীকরণ

উপনয়নের পর শ্রীবিশ্বম্ভর নবদ্বীপে অধ্যাপক-শিরোমণি শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। অতুলনীয় তাঁহার প্রতিভা, সূত্রব্যাখ্যা গুরুমুখে একবারমাত্র শুনিয়াই ধরিতে পারেন। কেবল ধরিতে বুঝিতেই যে পারেন তাহা নহে, সেই ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়া পুনরায় স্থাপন করিতেও পারেন। শত শত শিষ্য গুরুর নিকট পড়ে, কিন্তু এমন সামর্থ্য আর কাহারও নাই।

দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব-শিষ্য-শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥

মাতাপিতাও দেখিলেন :

পুঁথি ছাড়ি নিমাই না জানে কোন কর্ম।
বিদ্যারস তার হইয়াছে সর্ব ধর্ম॥ [ভা১।৬]

টোলে অন্যান্য ছাত্রেরা তাঁহার কাছে "পুঁথি চিন্তা" করিতে আসিত; তিনি "পক্ষ প্রতিপক্ষ" করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতেন। বয়স অল্প দেখিয়া যে না আসিত, তিনি তাহাকে শ্লেষবাণে জর্জরিত করিতেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার এক শিষ্যসমাজ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে শ্রীবিশ্বম্ভর স্বয়ং ব্যাকরণ-সূত্রের টিপ্পনী লিখিলেন এবং অল্পবয়সেই নবদ্বীপে প্রখ্যাত অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন।

নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহা ভাগ্যবান।
যার ঠাঞি করে প্রভু বিদ্যার আদান॥ [ভা ১।৭]

শ্রীবিশ্বম্ভর টোলে ব্যাকরণ মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ব্যাকরণেরই অধ্যাপনা করিতেন। তিনি যে কখন কিরূপে অলঙ্কার-ন্যায়াদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া বসিয়া আছেন, তাহা অন্যে জানিত না। অলঙ্কারে পণ্ডিত শ্রীমুকুন্দ ও ন্যায়-দর্শনে পণ্ডিত শ্রীগদাধর তাঁহার সঙ্গে তর্কে হার মানিয়া পলাইবার পথ খুঁজিতেন। অলৌকিক প্রতিভা ও শ্রুতিধরত্ব-গুণে দুইএক বার মাত্র শুনিয়া বা দেখিয়াই যে তিনি ঐসকল বষয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার শ্রুতিধরত্ব-শক্তি দিগ্বিজয়ি-পরাজয় কালে বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

শ্রীবিশ্বম্ভরের ন্যায় শ্রীগদাধরে বিদ্যার বিলাস নাই, কিন্তু বিদ্যাবত্তা আছে। অলৌকিক প্রতিভা ও শ্রুতিধরত্ব-গুণে তিনি পুরাণাদি শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কেহ তাঁহার সম্বন্ধে অনধীতশাস্ত্র

হইয়াও কেবল উপলব্ধি-বলে জ্ঞানবান্ বলিয়া মন্তব্য করিলে সহাস্যে বলিতেন, ওগো, আমি যে কত শুনেচি! অবশ্য শাস্ত্রীয় সকল জ্ঞানই তিনি কৈশোরে লাভ করেন নাই, বা লাভের সুযোগ পান নাই।

শৈশবে চঞ্চল গদাইকে কোলে বসাইয়া পিতা শ্রীখুদিরাম পূর্বপুরুষ-দিগের নাম, দেবদেবীর স্তোত্র কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান শুনাইতেন। একবারমাত্র শুনিয়াই বালক অধিকাংশ মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন এবং অনেকদিন পরে জিজ্ঞাসিত হইলেও সমভাবে আবৃত্তি করিতে পারিতেন।

গ্রামস্থ পাঠশালায় ভর্তি হইয়া শ্রীগদাধর স্বল্প কালেই লিখন-পঠনে সক্ষম হইয়া উঠিলেন, কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার রুচি জন্মিল না। নিজেদের বা পার্শ্ববর্তী গ্রামে যেখানেই পুরাণকথা বা যাত্রাভিনয় হইত, সঙ্গীদিগকে লইয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন, একমনে বসিয়া সমস্ত দেখিতেন ও শুনিতেন, এবং সঙ্গীতাদি সহ পালা কণ্ঠস্থ ও অভিনয়-ভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া ফিরিতেন। তারপরে যাত্রাদলের অনুকরণে দল-গঠন করিয়া সঙ্গীদিগকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেন। রাম, কৃষ্ণ, রাধা, বৃন্দা প্রভৃতি প্রধান ভূমিকাসকল তিনি স্বয়ং গ্রহণ করিতেন এবং অভিনয়কালে ভাবের আতিশয্যে একএক সময়ে সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। কণ্ঠস্বর ও অভিনয়-ভঙ্গী পরিবর্তন করিয়া তিনি কখন কখন একাকীই সমস্ত পালা অভিনয় করিতেন এবং পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে ও গ্রামের আবালবৃদ্ধ নরনারীকে অনাবিল আনন্দে ভাসাইতেন। আবার তাঁহাদের আগ্রহে, পাড়ার যুগীদের ও পাইনদের বাড়ীতে রামায়ণ, মহাভারত, এবং প্রহ্লাদ-চরিত্রাদি-পালার পুঁথি পড়িয়াও শুনাইতেন। ভক্তিগ্রন্থের মধুর আবৃত্তি ও সরস ব্যাখ্যা তাঁহার ন্যায় আর কেহই করিতে পারিতেন না।

নবদ্বীপে—তৎকালীন বিদ্যাবিলাসের কেন্দ্রস্থলে—শ্রীবিশ্বম্ভরের প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে ও অধ্যাপনে। কামার-

পুকুরে—পল্লীবাসীর সহজ সরল জীবনযাত্রার মর্মস্থলে—শ্রীগদাধরের প্রতিভা নিযুক্ত হইয়াছিল ভগবল্লীলাবহুল পৌরাণিক কথাদির আবৃত্তি ও অভিনয়ে এবং তত্তৎশিক্ষাদানে। এখানে শ্রীবিশ্বম্ভরের দিগ্বিজয়ি-জয়ের মতন ঘটনার অবসর কোথায়? তথাপি তজ্জাতীয় দিব্যপ্রতিভার সূচক ব্যাপারের যে একেবারে অভাব নাই, নিম্নোক্ত ঘটনাটি হইতে ইহা প্রতিভাত হইবে।

প্রতিবেশী জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীতে বহু পণ্ডিত শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তর্কবিতর্কের ধূম লাগিয়া গিয়াছে; কিন্তু জটিল প্রশ্নবিশেষের মীমাংসা কিছুতেই আর হইয়া উঠিতেছে না। নয় দশ বছরের বালক শ্রীগদাধর একপাশে বসিয়া নিবিষ্টমনে সমস্ত আলোচনা শুনিতেছিলেন, তিনি পরিচিত কোন পণ্ডিতকে বলিলেন, কথাটার এভাবে মীমাংসা হয় না কি? সেই পণ্ডিত ঐ মীমাংসা সভাস্থ অপরাপর পণ্ডিতকে জানাইলেন এবং সকলেই স্বীকার করিলেন যে উহাই সেই প্রশ্নের একমাত্র মীমাংসা। তারপরে, এক বালকের প্রতিভা ঐ অপূর্ব সমাধান দেখিতে পাইয়াছে জানিয়া পণ্ডিতগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে অবাক্ হইয়া দেখিতে, কেহ বা স্নেহবশে কোলে তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধনার প্রারম্ভে

অবতার-জীবনে সাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: 'নরলীলা নরবৎ'; 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'; "নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্ব লাভ করিতে হয়।" [লী ৩। অবতরণিকা]

'লীলা ঠিক যাত্রা করা মায়া-বেশ গায়।' [পুঁ] অভিনয়ে তত্তদ্ভাবের আবেশ আসিয়া উপস্থিত হইলে তবেই অভিনয় জমে—উহা স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী হয়। শ্রীরামচন্দ্র সীতা-হারা হইয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন।

অবতার-পুরুষের জীবনে এই মানবোচিত অপূর্ণতা বা স্বরূপ-বিস্মৃতি একেবারে অস্বীকার করা যায় না। করিলে, তৎকৃত সাধনা অর্থহীন হইয়া পড়ে এবং আমাদের মত দুর্বল মানবের প্রতি করুণায় অনুষ্ঠিত ঐ সাধনার উদ্দেশ্য ও ফল আমাদের জীবনে কার্যকরী হইতে বাধা জন্মে। অবশ্য, শাস্ত্রীয় বর্ণনা হইতে, আশৈশব দেবভাবের প্রকাশও যে সময়ে সময়ে তাঁহাতে দেখা যায় একথা মানিতেই হইবে। সেইজন্যই অবতার-চরিত্র অতি জটিল রহস্যে আবৃত। সেই রহস্য ভেদ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে বলিয়া আমরা শ্রদ্ধা সহকারে কেবল ঘটনাবলী দেখিয়া যাইবার চেষ্টা করিব।

সাধন-পীঠ

শ্রীচৈতন্যের সাধনপীঠ নবদ্বীপ জাহ্নবীতীরে অবস্থিত। নবদ্বীপের যে ধ্যান প্রচলিত আছে তাহা হইতে জানা যায়, উহা কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি এবং মনোরম উদ্যানসমূহে পরিপূর্ণ ছিল; যথা: 'স্বর্ধুন্যাশ্চারুতীরে স্ফুরিত-মতিবৃহৎ কূর্মপৃষ্ঠাভগাত্রং, রম্যারামাবৃতং… ।'

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটীও জাহ্নবীতীরে অবস্থিত। পূর্বে উহা কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি ও শ্মশান-সংযুক্ত ছিল; পরে সমতল করা হয় এবং মনোহর ফল ও পুষ্পের উদ্যান উহার শোভা বর্ধন করে।

অনুরাগ ও ব্যাকুলতা

সাধনার প্রথম মুখে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই জীবনে অনুরাগ ও ব্যাকুলতার ঝড় বহিয়াছিল। মানুষের ক্ষুদ্র মাপকাঠিতে উহার পরিমাপ হয় না। গয়াধামে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর দেশে ফিরিয়া ভগবদনুরাগে শ্রীচৈতন্যের কিরূপ বিহ্বল অবস্থা হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে শ্রীমুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন :

ততো রোদিতি স ক্বাপি নানাধারাপরিপ্লুতঃ।
নাসে চ শ্লেষ্মধারাভ্যাং বিপ্লুতে সংবভূবতুঃ॥
... .
রোদিতি স দিনং প্রাপ্য প্রবুধ্য রজনীমুখে।
দিবসোঽয়মিতি প্রাহ জনা উচুরিয়ং ক্ষপা॥
এবং রজন্যাং প্রেমার্দ্রঃ সর্বাং রাত্রিং প্ররোদিতি।
প্রহরৈকং দিবা যাতে ততোঽসৌ বুবুধে হরিঃ॥
ততঃ প্রাহ কিয়দ্রাত্রির্বর্ততে প্রাহ তং জনঃ।
দিবসোঽয়মতিপ্রেম্না ন জানাতি দিনং ক্ষপাম্॥
ক্বচিচ্ছ্রুত্বা হরের্নাম গীতং বা বিহ্বলঃ ক্ষিতৌ।
পততি শ্রুতিমাত্রেণ দণ্ডবৎ কম্পতে ক্বচিৎ॥
ক্বচিদ্ গায়তি গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি সাদরম্।
সন্নকণ্ঠঃ ক্বচিৎ কম্পরোমাঞ্চিততনু র্ভৃশম্॥
ভূত্বা বিহ্বলতামেতি কদাচিৎ প্রতিবুধ্যতে।
স্নাত্বা কদাচিৎ পূজাং স করোতি জগতীপতিঃ॥

নিবেদ্যান্নং ভগবতে ততো ভুংক্তে তদন্নকম্।
বিপ্রান্ ক্বচিৎ পাঠয়তি রাত্রৌ গায়তি নৃত্যতি। [মু ২।১]

কখনও তিনি এমনই রোদন করিতেন যে নানা অশ্রুধারায় সিক্ত হইতে থাকিতেন এবং শ্লেষ্মা নাসাযুগল প্লাবিত করিয়া ধারাকারে ঝরিতে থাকিত। ··· কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত দিন চলিয়া গেলে সন্ধ্যায় কিছুটা বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, এখন কি দিন? লোকে বলিত, এখন রাত্রি। এইরূপে প্রেমার্দ্র হইয়া সেই হরি সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইতেন, এবং প্রহরেক দিবা অতিক্রান্ত হইলে কিছুটা সংজ্ঞা লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, আর কত রাত্রি আছে? লোকে বলিত, এখন দিবা। অতিপ্রেমে তাঁহার দিনরাত্রির হুঁস থাকিত না। কখনও হরির নাম বা গীত শুনিবামাত্র বিহ্বল হইয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইতেন, কখন বা কাঁপিতে থাকিতেন। কখনও সাদরে গদ্‌গদকণ্ঠে 'গোবিন্দ কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া গান করিতেন, কখন বা তাঁহার দেহে অত্যন্ত কম্প ও পুলক হইত ও তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। কখনও তিনি প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিতেন। [সেই অবস্থায়] জগৎপতি স্নান করিয়া কখন কখন পূজা করিতেন, এবং ভগবানকে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই অন্ন ভোজন করিতেন। কখনও বিপ্রগণকে পড়াইতেন ও রাত্রিকালে নৃত্যগীত করিতেন।

এই অবস্থায় অভ্যাসবশে তাঁহার স্নানাহারাদি সম্পন্ন হইলেও, বিগ্রহ-পূজাদি নিত্য হইয়া উঠিত না।

প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায়, বিষ্ণু পূজিতে না পারে॥
স্নান করি বৈসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে
প্রেমজলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে॥

বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণু পূজে গিয়া॥
পুনঃ প্রেমানন্দজলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥

শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য—।
তুমি বিষ্ণু পূজ, মোর নাহিক সে ভাগ্য॥ [ভা ২।২৫]

মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের পর রাণী রাসমণির স্থাপিত ঠাকুরবাটীতে মা-কালীর পূজায় ব্রতী হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা ক্রমে কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল সেই সম্বন্ধে স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ "ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল,···ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।" [লী ৩।৬]

"ঠাকুর বলিতেন, শরীর-সংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে পক্ষীসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলি-রাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত। আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্‌বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত। ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না। পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন

চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকারক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে তাই অত কাঁদিতেছে।" [লী ৩।৮]

বরষায় রক্তপদ্ম যেন সরোবরে।
সেইমত রাঙ্গা-আঁখি ভাসে আঁখিনীরে॥
এতই ঝরিত বারি আঁখি-সরসিজে।
ধারায় ধরায় পড়ি মাটি যেত ভিজে॥
কত যে কান্দিলা প্রভু ধরি কলেবর।
ধরিতে পারিলে বারি হইত সাগর॥ [পুঁ]

রাগাত্মিকা ভক্তির প্রবল প্রবাহে তাঁহার বৈধ পূজাদি আপনা হইতেই ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়রাম অপর এক ব্রাহ্মণের সহায়তায় কোনরূপে মন্দিরের বিহিত পূজাদি চালাইয়া নিতেছিলেন। এমন সময় ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীরামতারক কর্মান্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলে কর্তৃপক্ষ তাঁহাকেই সাময়িকভাবে মা-কালীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন।

যোগজ বিকারে বায়ুরোগ-ভ্রান্তি

গয়াধামে গমনের পূর্বে শ্রীচৈতন্য একবার ঐশ্বরিক ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন:

আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি ফেলে॥
. . .

ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্ছা হয়, লোকে দেখি পায় ভয়॥

আত্মীয়বন্ধুগণ ছুটিয়া আসিলেন এবং বিকারের কারণ সম্বন্ধে এক-এক জন একএক প্রকার মত প্রকাশ করিলেন।

কেহো বোলে, হইল দানব-অধিষ্ঠান।
কেহো বোলে, হেন বুঝি ডাকিনীর কাম॥
কেহো বোলে, সদাই করয়ে বাক্যব্যয়।
অতএব হইল বায়ু জানিহ নিশ্চয়॥ [ভা ১।৮]

অবশেষে বায়ুরোগের অভিমতটাই প্রাধান্য লাভ করিল এবং তাঁহার মস্তকে ও দেহে নানাবিধ পাকতৈল দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। পাছে রোগ আবার দেখা দেয় সেই ভয়ে তাঁহার মাথায় পাকতৈল মাখানোর ব্যবস্থাটা একরূপ পাকাপাকি হইয়া গেল। তিনি অধ্যাপনা করিতেন, আর একজন মাথায় বিষ্ণুতৈল মাখাইতে থাকিত। পূর্ব হইতেই বিবাহিত না থাকিলে কেহ কেহ যে অবিলম্বে তাঁহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দিতেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

গয়াধাম হইতে ফিরিয়া মহাপ্রভুর ভাবের বিকার অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। লোকজন আসিয়া শ্রীমতী শচীদেবীকে বলিতে লাগিল ঃ

পূর্বকার বায়ু আসি জন্মিল শরীরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥
খাইবারে দেহ ডাব-নারিকেল-জল।
যাবত উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল॥
কেহো বোলে—ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত-প্রয়োগে, সে এবায়ু নিস্তরে॥

পাকতেল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবত প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান॥

শচীদেবী ভাবিয়া আকুল হইলেন। তাঁহার প্রেরিত লোকের মুখে সংবাদ পাইয়া প্রবীণ ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিত আসিলেন এবং একদৃষ্টে মহাপ্রভুর ভগবৎপ্রেম-জনিত সাত্ত্বিক বিকারসমূহ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

কেহো বোলে মহাবায়ু, বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত! তোমার চিত্তে কি লয় আমারে?
হাসি বোলে শ্রীবাস পণ্ডিত—ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই॥
মহা ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে॥

এইকথা শুনিয়াই মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ঃ

সভে বোলে বায়ু, সবে প্রশংসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি॥
যদি তুমি বায়ু-হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি আমি গঙ্গার ভিতরে॥

ভক্তিশাস্ত্রের মর্মজ্ঞ শ্রীবাস শচীদেবীকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিলেন ঃ

বায়ু নহে—কৃষ্ণভক্তি, বলিল তোমারে।
ইহা কভু অন্যজন বুঝিবারে নারে॥
ভিন্নলোক স্থানে ইহা কভু না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা॥ [ভা ২।২]

এক অসীম সৌন্দর্যবোধে তন্ময় হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালেই আপনাতে আপনি ডুবিয়া গিয়াছিলেন। নবীন মেঘের কোলে এক ঝাঁক দুধের মত সাদা বক অনন্ত আকাশে উড়িয়া যাইতেছে—টেকোয় জল-খাবার মুড়ি লইয়া সকালবেলা মাঠের আল্‌পথে যাইতে যাইতে তিনি দেখিতে পাইলেন এবং একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। বাহিরে মূর্ছার মত দেখাইলেও তাঁহার ভিতরে ছিল অপূর্ব আনন্দের অনুভূতি এবং স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। তথাপি এই ঘটনায় তাঁহার কঠিন রোগের সূত্রপাত হইল ভাবিয়া মাতাপিতা বিষম চিন্তিত হইলেন এবং চিকিৎসা ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

অতঃপর দেবস্বভাব বালকের জীবনে দেব-দেবীর চিন্তা বা তাঁহাদের ভূমিকা অভিনয় করিতে যাইয়া এইরূপ দিব্যভাবের আবেশ মাঝে মাঝে হইতে লাগিল এবং তাঁহার জননী উহাতে বায়ুরোগের প্রকোপ আশঙ্কা করিয়া শঙ্কিতা হইয়া দেব-দেবীর কাছে পূজাদি মানত করিতে লাগিলেন। এইভাবে কতিপয় বৎসর গেল।

যৌবনে, জগন্মাতার ঐকান্তিক প্রেমে আত্মহারা ঠাকুরের ক্রিয়া-কলাপ যখন বিষয়ী লোকের কাছে অর্থহীন ও অসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হইল, ভাগিনেয় হৃদয় তখন মাতুলকে বায়ুরোগগ্রস্ত জ্ঞান করিয়া কবিরাজী চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিল এবং রোগ সারিবার কোনও লক্ষণ না দেখিয়া দেশে কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল।

রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীমথুরানাথ ঠাকুরের উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা অনেকটা বুঝিতে পারিলেও উহার সঙ্গে উন্মত্ততার সংযোগ অনুমান করিলেন এবং প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না হইলেও ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া হৃদয় মধ্যে মধ্যে কবিরাজের কলিকাতার বাড়ীতে যাইত। সেই বাড়ীতে পূর্ববঙ্গের আর একজন বিজ্ঞ বৈদ্য রোগের লক্ষণসকল শুনিতে শুনিতে বলিয়াছিলেন,—ইঁহার দেবোন্মাদ অবস্থা

বলিয়া বোধ হইতেছে ; উহা যোগজ ব্যাধি—ঔষধে সারিবার নহে। কেহই এই বৈদ্যের কথায় বিশ্বাস করিল না ; সুতরাং নানারূপ চিকিৎসারও বিরাম হইল না।

ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা চিন্তাকুল হইয়া তাঁহাকে দেশে আনাইলেন। ঔষধ ব্যবহারের সহিত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি দৈবক্রিয়াও চলিতে লাগিল। "একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পল্‌তে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল ; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে ; কিন্তু কিছুই হইল না। পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল, উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাই।" [লী ৩/৯]

দৈবকৃপায় বায়ুরোগের অনেকটা উপশম হইয়াছে ভাবিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ দিল। উদ্দেশ্য—পত্নীপ্রেমে আবদ্ধ হইলে বায়ুরোগটা চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইবে। অদ্ভুত ঠাকুরের একের পর অন্য চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁকে যেমন আপত্তি নাই, বিবাহেও তেমনি আপত্তি নাই। কিন্তু বিবাহের পরে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া পুনরায় যে-কে-সেই অবস্থা! ভগবদ্বিরহে ব্যাকুলতা ও মিলনে উল্লাস আবার উদ্দাম হইয়া দেখা দিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সংবাদ পাইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, মহাদেবের নিকট হত্যা দিলেন। "তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জ্বলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বরপরিহিত রজতদলিতকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন—'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে।'" [লী ৩/৯]

তৃতীয় অধ্যায়

শক্তি-আরাধনা

শক্তি-তত্ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলি, যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলি। স্থির জল—ব্রহ্মের উপমা; জল হেল্‌চে দুল্‌চে—শক্তির উপমা।' [ক ১।১২।৯]

জগৎকারণকে যখন নির্গুণ নিষ্ক্রিয় বলিয়া চিন্তা করা হয়, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম, শুদ্ধ ব্রহ্ম বা নির্গুণ ব্রহ্ম বলা হয়; আর জগৎকারণকে যখন সগুণ সক্রিয় বলিয়া চিন্তা করা হয়, তখন তাঁহাকে শক্তি, ব্রহ্মশক্তি, আদ্যাশক্তি, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে।

শক্তি বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা নির্গুণ ব্রহ্মে পৌছিবার দ্বারস্বরূপ। সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার ঘটিবার পরে নির্গুণ ব্রহ্মের উপলব্ধি স্বাভাবিক নিয়মে উপস্থিত হইয়া থাকে। যতদিন ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি না ঘটে, ততদিন জগৎকারণের পূর্ণ সাক্ষাৎকার হয় না; এবং জীব চিরকালের জন্য অভয় মুক্তিপদবীতে বা আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

প্রতিমায়, প্রতীকে বা যন্ত্রে যাহাতেই করা হউক না কেন, পূজা বা উপাসনা মাত্রেই শক্তির আরাধনা। কারণ, তাহাতেই জগৎকারণের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তৃত্বাদি গুণ আরোপিত হইয়া থাকে। সুতরাং ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে, উপাসক মাত্রেই শক্তির উপাসক বা শাক্ত।

তথাপি ভারতে আমরা উপাসকমণ্ডলীকে যে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণবাদি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাই, ইহার কারণ কী?

'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।'[১] সাধকগণের হিতের জন্য ব্রহ্মের বিবিধ রূপ—যেমন, শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, রাধা—কল্পনা করা হইয়াছে। সাধক নিজের ইচ্ছামত যে ঐসকল রূপ কল্পনা করিয়া থাকেন, তাহা নহে। বিভিন্ন রুচির সাধকগণের বিভিন্ন ভাবের উপযোগী ঐসকল রূপ ধরিয়া ঈশ্বরই তাঁহার কাছে প্রকাশিত হন। যিনি যে রূপের উপাসক, তাঁহাকে তদনুযায়ী নামে নির্দেশ করা হইয়া থাকে ; যেমন,—শিবরূপের উপাসক শৈব, বিষ্ণু বা তদবতারগণের উপাসক বৈষ্ণব।

জড় বা চেতন বলিয়া প্রতীত যাহা কিছু নামরূপাত্মক তাহাই শক্তির বিকাশ হইলেও নারীমূর্তিতে ঐ শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশিত। কারণ, 'সন্ধিনী' বা সৃজনী ও পালনী, এবং 'হ্লাদিনী' শক্তির বিশেষ প্রকাশ নারীমূর্তিতে সকলেরই প্রত্যক্ষীভূত।[২] এই বিশিষ্টতার জন্য নারীপ্রতীকে জগৎকারণ বা ঈশ্বরের উপাসনা প্রবর্তিত হয় এবং জগদম্বা-জ্ঞানে তাঁহাকে আরাধনা করিতে যাইয়া সাধকেরা তাঁহার জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গাদি করালমধুরা কোটিব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী চিন্ময়ী মূর্তির দর্শনলাভে ধন্য হন। ঐসকল মূর্তি বিশেষভাবে 'শক্তি' নামে পরিচিত হওয়ায় তাহাদের উপাসকেরাই কেবল 'শাক্ত' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন, এবং 'শক্তি' ও 'স্ত্রী' শব্দ দুইটি একার্থবাচক হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর এই বিশিষ্ট অর্থেই 'শক্তি' শব্দ প্রযুক্ত হইবে।

অবতারগণের শক্তিপূজা

শক্তিপূজা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, বিশেষতঃ কলিকালে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, কলিকালে বেদ-পুরাণ কানে শুনিতে হয়, কিন্তু অনুষ্ঠান করিতে হয় তন্ত্র-মতে। তন্ত্রে শক্তিপূজারই প্রাধান্য।

১ কুলার্ণবতন্ত্র, ষষ্ঠোল্লাস। ব্রহ্মণঃ—কর্তরি ষষ্ঠী।

২ নিরুত্তর তন্ত্রে—নারীরূপং সমাস্থায় সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে।
বিষ্ণুমায়া মহালক্ষ্মী মোহয়ত্যখিলং জগৎ॥ (তন্ত্রতত্ত্ব-ধৃত)

অবতারপুরুষগণের আচরণ হইতেও শক্তিপূজা বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক অবতারই সযত্নে শক্তির উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ঐ উপাসনার কারণ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—সকলেই সেই মহামায়া আদ্যাশক্তির অধীনে ; অবতার আদি পর্যন্ত মায়া আশ্রয় করিয়া তবে লীলা করেন, তাই তাঁহারা আদ্যাশক্তির পূজা করেন। শক্তির বিশেষ কৃপা লাভ না করিয়া লোকগুরু হওয়া যায় না, প্রবল ধর্মতরঙ্গে দেশ প্লাবিত করা যায় না, বা বহুজনহিতায় বহুকাল-স্থায়ী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় না।

শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিপূজা পুরাণ-প্রসিদ্ধ। আজও সেই সূত্র ধরিয়া আমরা শারদীয় দুর্গোৎসবে মাতিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ রাধা-যন্ত্র কুড়াইয়া পাইয়া তাহা লইয়া অনেক সাধনা করিয়াছিলেন। 'যন্ত্র ব্রহ্মযোনি, তাঁরই পূজা, তাঁরই ধ্যান। এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্চে।' [ক ৪।২৩।৯] এই প্রসঙ্গে ব্রজবালাগণের কাত্যায়নী-পূজারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীশঙ্করাচার্য শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে নানাভাবে ভগবতীর প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সরস্বতীর অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ 'উভয়ভারতী'র নিকট বর-গ্রহণ হইতেই বুঝা যায়।[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিপূজা

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি-সাধনা এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা। মা-কালী তাঁহার ইষ্ট ছিলেন। তাহার সপ্রেম ব্যাকুল আহ্বানে

৩ স্বামী সারদানন্দ অন্নপূর্ণাদেবীকে শঙ্করাচার্যের ইষ্ট বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কাঞ্চীর ৺কামাক্ষী-মন্দিরে শঙ্করাচার্যের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন ও নিত্যপূজা পাইতেছেন ; তিনি তথায় ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। শৃঙ্গেরী মঠে ত্রিপুরা-যন্ত্র স্থাপিত আছে ও সেই যন্ত্রে পূজা হয়। শঙ্করাচার্য ললিতা-সপ্তশতীর ভাষ্য লিখিয়াছেন।

পাষাণ-প্রতিমা চিন্ময়ী হইয়া দেখা দেন! সেই চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি মায়ের অনুমতি লইয়া তিনি অন্যান্য সকল ধর্মমতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন—সেই সেই মতে কিভাবে মার উপাসনা হয় দেখিবার জন্য, আর এইরূপে সকল মতের সত্যতা প্রমাণ করিয়া ধর্ম-সমন্বয় ও ধর্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য। তিনি সন্ন্যাস লইয়া বেদান্ত-মতের সাধনাও করিয়াছিলেন এই আদ্যাশক্তি মহামায়ারই নির্দেশে। কারণ, মা-ই তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—তিনি কেবল চিন্ময়রূপধারিণীই নহেন, অরূপা শুদ্ধচিৎ-স্বরূপাও তিনি; কেবল সগুণাই নহেন, নির্গুণাও তিনি; একই কালে সগুণা ও নির্গুণা উভয়ই তিনি। জগদম্বার কৃপায় নানাভাবে তাঁহার পূর্ণ পরিচয় লাভ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নবযুগে নূতন বার্তা প্রচার করিলেন: যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, জগৎলীলা। লীলা কেবল বিলাসের জন্য নহে—উহা যাদুকরের যাদু বা ভেল্‌কি মাত্র নহে; লীলাও সত্য।

মহাশক্তি রাখে যদি প্রচ্ছন্ন মায়ায়।
কোন্ কালে কোন্ বলে কে চৈতন্য পায়॥
বরাবর তাই প্রভু এই অবতারে।
নিজে ভজি দিলা শিক্ষা শক্তি ভজিবারে॥ [পুঁ]

শ্রীচৈতন্যের শক্তিপূজা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও অন্যান্য অবতারপুরুষগণের ন্যায় শ্রীচৈতন্যও শক্তির আরাধনা করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে উহার উল্লেখমাত্র নাই; বরং শক্তিপূজকগণের বহু নিন্দাই তাহাতে শুনা যায়। সেই যুগের শাক্ত-বৈষ্ণবের পরস্পর বিদ্বেষ ও স্বমত-প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টাই তজ্জন্য দায়ী।

শ্রীচৈতন্যের শক্তিপূজা চিরকালের জন্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, যদি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগদৃষ্টিতে জানিতে পারিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট উহা প্রকাশ না করিয়া যাইতেন। তিনি বলিয়াছেন: "দেখলাম খোলটি ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল; এসে বল্লে, 'আমি যুগে যুগে অবতার।' তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলচি। তারপর চুপ করে থেকে দেখলাম। তখন দেখি আপনি বলচে, 'শক্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।' "[৪] [ক ৩।১২।৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতে ইহাও জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্য অন্নপূর্ণা-দেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন।[৫]

বৌদ্ধযুগের অবসানে ধর্মের নামে কদাচারে ভারতবর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। অনিষ্টকর ভোগৈষণাপূর্ণ বৌদ্ধ তন্ত্রসমূহ দ্বারা হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র কোন কোন অংশে প্রভাবিত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-কালে সেই অনিষ্টকর প্রভাব হইতে দেশ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারে নাই। তিনি ও তদভিন্নস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া শক্তি-সাধনার পবিত্র আদর্শ জনসমাজে স্থাপন করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে যদিও শ্রীচৈতন্যের শক্তি-সাধনা উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার শক্তি ও শাক্ত-প্রীতির সূচক ঘটনার একেবারে অভাব নাই। একদিন প্রকৃতি-ভাবে অভিনয় করিতে যাইয়া, আদ্যাশক্তির ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি স্বীয় ভক্তগণকে স্তন্যপান করাইয়াছিলেন। আমরা সেই সকল বর্ণনা একে একে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব।

(১) শাক্ত সন্ন্যাসীর আলয়ে ভোজন

শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে চলিয়াছেন—

---

৪ দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অনুরূপ এক পরমহংস-মূর্তি মধ্যে মধ্যে দেখিতে ও তাঁহার কথাবার্তা শুনিতে পাইতেন।

৫ ভারতে শক্তিপূজা, তৃতীয় প্রস্তাব।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ঘরে যাইবেন। পথিমধ্যে ললিতপুর নামে গ্রাম। সেই গ্রামে গঙ্গার নিকটে এক প্রবীণ তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বা কৌলাবধূত সস্ত্রীক বাস করিতেন। দুই ভাই তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। সাধু-গোষ্ঠীর পর অবধূত তাঁহাদিগকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন—

নিত্যানন্দ বোলে—কার্য-গৌরবে চলিব।
কিছু দেহ, স্নান করি পথেতে খাইব॥
সন্ন্যাসী বোলয়ে—স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥

.. ..

জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল পথশ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন॥
দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।
শেষে খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ॥

অবধূত বামাচারী ছিলেন, সেইজন্য মদ্যাদি গ্রহণ করিতেন। তিনি নিত্যানন্দকে কিঞ্চিৎ বয়স্ক দেখিয়া—এবং হয়তো বা তাঁহারই মত তান্ত্রিক সাধক জ্ঞান করিয়া—সরলচিত্তে ইসারায় কহিলেন ঃ

শুনহ শ্রীপাদ! কিছু 'আনন্দ' আনিব?
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব?

.. ..

আনন্দ আনিব?—ন্যাসী বোলে বারবার।
নিত্যানন্দ বোলে—তব লড় সে আমার॥

... ...

প্রভু বোলে—কি 'আনন্দ' বোলয়ে সন্ন্যাসী?
নিত্যানন্দ বোলয়ে—মদিরা হেন বাসি॥

'বিষ্ণু বিষ্ণু' স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর।
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥ [ভা ২।১৯]

বামপন্থী হইলেও এই অবধূত নিশ্চয়ই অকপট সাধক ছিলেন, নতুবা শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ তাঁহার কুটীরে যাইতেন না; আর গেলেও, তৎপ্রদত্ত আহার্য তৃপ্তির সহিত খাইতেন না।

(২) শাক্ত সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিলনানন্দ

সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য পুরীর পথে চলিয়াছেন—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ও মুকুন্দ-গদাধরাদি ভক্তগণ। "বাঁশধায়-পথে" এক শাক্ত অবধূত আসিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলেন।

শাক্ত হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥
প্রভু বোলে—কহ কহ কোথা তুমি-সব।
চিরদিনে আজি দেখিলাঙ যে বান্ধব॥

শ্রীচৈতন্যের পরমাত্মীয়বৎ মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া অবধূত—

যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সভে কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে॥
শাক্ত বোলে—চল ঝাট মঠেতে আমার।
সভেই আনন্দ আজি করিব অপার॥
পাপী শাক্ত মদিরারে বোলয়ে আনন্দ।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥
প্রভু বোলে—আসি আমি আনন্দ করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥

শুনিয়া চলিল শাক্ত হই হরষিত।
এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥

.. ..

লোকে বোলে—এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ-শাক্ত-পবশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥ [ভা ৩।২]

বৈষ্ণবগণের প্রিয় গ্রন্থ 'ভক্তমালে'র ষষ্ঠমালায় আছে :

বৈষ্ণব দেখিয়া মহা আনন্দ করিব।
কত কালের বন্ধু যেন দেখি হৃষ্ট হব॥
যাঁর কৃষ্ণে শুদ্ধভক্তি তাঁর এই রীত।
স্বাভাবিক জন্মে ভক্ত দেখিয়া পিরীত॥

মহাপ্রভুর শাক্ত দেখিয়া স্বাভাবিক প্রীতি, 'বান্ধব' বলিয়া সম্বোধন, অন্যান্য শক্তি-সাধকেরা কে কোথায় আছে সেই সংবাদ-সংগ্রহ—এই সকল দেখিয়া কি বলিতে ইচ্ছা করে না যে, তাঁহার যেমন কৃষ্ণে তেমনি শক্তিতেও শুদ্ধভক্তি ছিল? এস্থলে তাঁহাকে কপটাচারী মনে করিবার কারণ দেখা যায় না। শাক্ত-মাত্রই পাষণ্ড বলিয়া বিশ্বাস থাকিলে তিনি তাহার সহিত বাক্যালাপ না করিতে, অথবা প্রভাবিত করিয়া তাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে পারিতেন। মহাপ্রভুর ব্যবহারে ও কথাবার্তায় মনে হয়, ঐ অবধূত একজন উন্নত শক্তি-সাধক। মহাপ্রভুকে তিনি যে চক্রানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। মহাপ্রভু সেই আমন্ত্রণ গ্রহণও করিয়াছিলেন; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য করিয়াছিলেন কিনা, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 'এইমত ঈশ্বরের অগাধ চরিত' এই বাক্য হইতে তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়।

কাশীতে ভৈরব-ভৈরবীরা শ্রীরামকৃষ্ণকে তাহাদের চক্রানুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। তিনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চক্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহাদের মত কারণ-গ্রহণাদি করেন নাই। তাঁহার আচরণের সঙ্গে মহাপ্রভুর আচরণের সাদৃশ্য এস্থলে সহজেই প্রতীত হয়।

(৩) আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ ও ভক্তগণকে কৃপা

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন এক অভিনব ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়া ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, 'আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের ['অঙ্ক'-নামক দৃশ্যকাব্যের] বিধানে।'

সদাশিব বুদ্ধিমন্ত-খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু—কাচ-সজ্জ কর গিয়া॥
শঙ্খ, কাঁচুলী, পাটশাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥

কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করিবেন তাহাও মহাপ্রভু নিজেই নির্দেশ করিয়া দিলেন। ঠিক হইল, গদাধর রুক্মিণী সাজিবেন, ব্রহ্মানন্দ হইবেন তাঁহার বড়াই। মহাপ্রভু নিজেও প্রকৃতি-বেশে অভিনয় করিবেন আর নিত্যানন্দ হইবেন তাঁহার বড়াই। হরিদাস কোতোয়াল, শ্রীবাস নারদ, শ্রীরাম স্নাতক।

অদ্বৈত বোলয়ে—কে করিব পাত্র-কাচ ?
প্রভু বোলে—পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥

চন্দ্রশেখর আচার্যের বাটিকা অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট হইল। ভক্তগণের উল্লাসের সীমা নাই।

সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য চন্দ্রশেখরের ঘর॥

আই চলিলেন নিজ বধূর সহিতে ।

... ...

যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার ।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার ॥

সকলেব আগে—

কীর্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ—।
রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ ।

তারপরেই—

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু-হরিদাস ।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস ॥
মহাপাগ শোভে শিরে, ধটি পরিধান ।
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান—॥
আরে আরে ভাই-সব ! হও সাবধান ।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥

কোতোয়ালরূপী হরিদাসের সঙ্গে দর্শকগণের কথাবার্তা চলিয়াছে. এমন সময় সশিষ্য নারদ সভামধ্যে দেখা দিলেন। অদ্বৈত গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন :

কে তুমি আইলা হেথা কোন্ বা কারণে ?

শ্রীবাস উত্তর দিলেন :

নারদ আমার নাম—কৃষ্ণের গায়ন ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে ।
শুনিলাঙ কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে ॥

..

প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥
এদিকে—গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলি কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র—সপ্তশ্লোক ভাগবতে।
যে আছে, পঢ়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥

প্রথম প্রহরের অভিনয় সাঙ্গ হইল। দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর গোপী-সাজে, সখী ও বড়াই-সঙ্গে, আসিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার নৃত্য ও সহচরের সময়োচিত গীত সকলকে মুগ্ধ করিল।

হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ—বড়াইবুড়ীর বেশে।
কেহো নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত-বেশ অতি মনোহর॥
... ...
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী॥

কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া॥
এইমত অন্যোহন্যে সর্ব জনে জনে।
না চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥

... .

জগতজননী-ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥
হেন দঢ়াইতে কেহো নারে কোনজন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥
কখনো বোলয়ে—বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা?
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥
নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট-অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী-হেন সভে বুঝেন প্রকাশে॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে॥
ক্ষণে বোলে—চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।
গোকুলসুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহা কোটিযোগেশ্বরী॥

... ...

সর্বশক্তিস্বরূপা নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহো নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥

দর্শক, শ্রোতা, গায়ক সকলেই প্রেমসাগর-তরঙ্গে ভাসমান। 'কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাই।' বড়াই-বেশী নিত্যানন্দ ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। চারির্দিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এমন সময়ে মহাপ্রভু চকিতে গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া বিষ্ণুখট্টায় আসীন হইলেন।

সম্মুখে রহিলা সভে যোড়হস্ত করি।
মোর স্তব পঢ়—বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্বজনে।
সেইরূপে সভে স্তুতি পঢ়ে, প্রভু শুনে॥
কেহো পঢ়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহো চণ্ডীস্তুতি।
সভে স্তুতি পঢ়েন—যাহার যেন মতি॥
জয় জয় জগৎ-জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ চরণের ছায়া॥
জয় জয় অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-কোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে, অন্যে কে দিবেক সীমা॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মূর্তিভেদ।
সর্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি, কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিপূর্ণ তুমি মাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা॥
তুমি ত্রিজগৎ-হেতু গুণত্রয়ময়ী।

ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, জানে কোই ॥
সর্বাশ্রয়া তুমি সর্বজীবের বসতি ।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি ॥
জগৎ-আধার তুমি দ্বিতীয়-রহিতা ।
মহীরূপে তুমি সর্বজীব-পালয়িতা ॥
জলরূপে তুমি সর্ব জীবের জীবন ।
তোমায় সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্তিমতী ।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপা প্রকৃতি ॥

... ...

সভে লইলাঙ মাতা তোমার শরণ ।
শুভদৃষ্টি কর, তোর পদে রহু মন ॥

এইরূপ স্তবস্তুতিতে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। এমন আনন্দেও বিচ্ছেদ ঘটিবে ভাবিয়া বিষাদে ভক্তগণ অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু—

মাতাপুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ ।
এইমত সভারে দিলেন পুত্রভাব ॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া ।
স্তনপান করায় পরম স্নিগ্ধ হৈয়া ॥
কমলা পার্বতী দয়া মহানারায়ণী ।
আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী ॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা ।
আমি পিতা পিতামহ, আমি ধাতা মাতা ॥

...

আনন্দে বৈষ্ণব-সর্ব করে স্তন পান।
কোটি কোটি জন্ম যারা মহাভাগ্যবান্॥ [ভা ২।১৮]

এই একদিনের ঘটনা হইতে আমরা শাস্ত্রযুক্তিবলে ও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন-লীলার আলোকে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলি অনায়াসে করিতে পারিতেছি ঃ

১। মহাপ্রভুর আদ্যাশক্তিরূপে এই মহাপ্রকাশ আদ্যাশক্তির সঙ্গে তাঁহার অভিন্নতা ও একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। 'শক্তিরই অবতার'—শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন। ভক্তগণ যে স্তব করিয়াছেন তাহাতেও আছে, 'তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি।'

২। এই আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ তাঁহার আদ্যাশক্তি-আরাধনার সম্ভাব্যতা নির্দেশ করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, কখন কখন তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ হইতে দেখা গিয়াছে।

৩। এই প্রকাশের সময় ভক্তগণ যে চণ্ডী-স্তুতি করিয়াছেন তাহা শক্রাদি-স্তুতি ; অর্থাৎ চণ্ডীতে মহিষাসুর-বধের পর ইন্দ্রাদি দেবতারা যে স্তব করিয়াছিলেন সেই স্তব। বৃন্দাবনদাসের ভাষানুবাদ পড়িয়া তাহাই বুঝা যায়। লোচনদাস স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, 'তবে স্তব কৈল সভে সুরকৃত মহাস্তবে।' যাঁহারা এই স্তব পাঠ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সমগ্র চণ্ডীখানা, অন্ততঃ চণ্ডীতে বর্ণিত স্তবগুলি কণ্ঠস্থ ছিল, এবং ঐ স্তবের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণের যোগও ছিল, নতুবা এমন স্বতঃস্ফূর্ত আবেগমাখা আবৃত্তি সম্ভব নহে। ইহা সেইসকল ভক্তের নিত্য বা সময়ে সময়ে চণ্ডীপাঠের নিদর্শন। ইহা সেইসকল ভক্তের শক্তি-উপাসনারও নিদর্শন। কারণ, শক্তি-সাধক ভিন্ন কেহ এমন করিয়া চণ্ডী মুখস্থ করে না। সুতরাং মহাপ্রভু যেমন শক্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার অনেক পার্ষদ-ভক্তও শক্তিসাধক ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ

কলিকাতা শ্যামপুকুরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণের শয্যাপার্শ্বে গন্ধপুষ্প ধূপদীপ ও ফলমূল-মিষ্টান্ন আনিয়া রাখা হইতেছে। আজ শ্যামাপূজা। পূর্বদিন ঠাকুর তাঁহার কোন কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'পূজার উপকরণ সংক্ষেপে সংগ্রহ করে রাখিস—কাল কালীপূজা করতে হবে।'

দেখিতে দেখিতে সূর্যাস্ত হইয়া রাত্রি ৭টা বাজিয়া গেল। ধূপদীপ প্রজ্বলিত হওয়ায় সৌরভে ও আলোকে ঘরখানি ভরিয়া উঠিল। ত্রিশজনের অধিক ভক্ত নীরবে বসিয়া একমনে ঠাকুরকে দেখিতে লাগিলেন—কেহ তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন, কেহ বা জগদম্বার চিন্তা করিতেছেন। এইভাবে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলেও ঠাকুর স্বয়ং পূজা করিতে অগ্রসর হইলেন না, বা পূজা করিবার জন্য কাহাকেও আদেশ দিলেন না। নিশ্চিন্তমনে স্থির হইয়া বিছানায় বসিয়া রহিলেন।

ইহাতে ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, ঠাকুরের দেবদেহরূপ চিন্ময় প্রতিমায় জগদম্বার পূজা করিয়া ভক্তেরা আজ ধন্য হইবে বলিয়াই এই আয়োজন! অধীর উল্লাসে সহসা পুষ্পচন্দন লইয়া তিনি ঠাকুরের পাদপদ্মে 'জয় মা' বলিয়া অঞ্জলি দিলেন। ঠাকুরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল ও তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখে দিব্য হাসি ফুটিয়া উঠিল ও হস্তে বরাভয়মুদ্রা দেখা দিল। ভক্তেরা দেখিলেন ও বুঝিলেন জ্যোতির্ময়ী দক্ষিণা মূর্তিতে দেবী সহসা তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন!

পুষ্পপাত্র হইতে ফুলচন্দন লইয়া ও ইচ্ছামত্নরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভক্তগণের প্রত্যেকেই শ্রীপাদপদ্ম পূজা করিলেন। 'জয় মা! জয় মা!' শব্দে গৃহ মুখরিত হইল। স্তুতি ও প্রার্থনারূপে একে একে অনেকগুলি সঙ্গীত গীত হইল। ঠাকুর ক্রমে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন, এবং সম্মুখে ধৃত নৈবেদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া ভক্তগণকে আশীর্বাদ করিলেন।

ঠাকুরের সেই "দিব্যহাস্যফুল্ল প্রসন্ন আনন ও বরাভয়যুক্ত করদ্বয়" ভক্তদের প্রাণে চিরজাগরূক হইয়া রহিল—অনাগত ভবিষ্যতের দুঃখ-দুর্দিনে তাঁহাদের জীবন যে সর্বথা দেবরক্ষিত এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য।

শ্রীনিত্যানন্দের শক্তিপূজা

শ্রীচৈতন্যাবতারে শক্তিপূজার ভাবটি বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছিল তদীয় একতর বাহু তদভিন্নস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর ভিতর দিয়া। নিত্যানন্দ আবাল্য শক্তিসাধক ছিলেন। দ্বাদশবৎসর বয়সে যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসী যদি তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু হইয়া থাকেন তাহা হইলে ঐ সন্ন্যাসী কৌলাবধূত ছিলেন, সন্দেহ নাই। কারণ, নিত্যানন্দের 'অবধূত' সংজ্ঞা তান্ত্রিক সন্ন্যাস নির্দেশ করিতেছে। যাহারা ইহাতে সন্দেহ পোষণ করেন, নিম্নোক্ত বিষয়টি অনুধাবন করিয়া দেখিলে তাহাদের সেই সন্দেহ দূরীভূত হইবে।

সন্ন্যাস-অবস্থায় তীর্থাদি পরিভ্রমণ-কালে নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন ও পূজা পাইতেন—ঝুলিতে 'নীলকণ্ঠ' নামক শিবলিঙ্গ, বক্ষে চতুর্দশচক্রযুক্ত 'অনন্ত' নামক শালগ্রাম এবং জটায় 'ত্রিপুরাসুন্দরী'-যন্ত্র। ত্রিপুরাসুন্দরী—ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। ঐ অপূর্ব বস্তুগুলি এখনও খড়দহে ৺শ্যামসুন্দরের সিংহাসনে বিরাজ করিতেছেন ও পূজা পাইতেছেন। শ্যামসুন্দর দর্শন করিতে যাইয়া আমরা ঐ সিদ্ধ দেবপ্রতীকগুলিও দর্শন করিয়াছি এবং মন্দিরের পূজকের ও তথাকার লোকদের মুখে পূর্বোক্ত বিবরণ শুনিয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ খড়দহে যাইয়া ঐ বস্তুগুলি দর্শন করিয়াছিলেন, এবং ত্রিপুরা-যন্ত্র সম্বন্ধে তদীয় পার্ষদভক্ত মাষ্টার বা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, ঐ সিদ্ধযন্ত্র লইয়া যোগ্য সাধক কেহ যদি আরাধনা করে, তাহা হইলে সহজেই সিদ্ধিলাভ করিবে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ স্পষ্টই লিখিয়াছেন : 'অদ্বৈতাচার্য প্রভুর ন্যায় ইনি [নিত্যানন্দ] তৎকাল-প্রচলিত স্মার্তাচারের পক্ষপাতী ছিলেন না, ইঁহার নিকটে উচ্চ ও নীচের—স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যের কোন ভেদ ছিল না।...তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধানতম পরিচালক পুরুষ হইয়াও নিজগৃহে খড়দহে শক্তি-প্রতিমার উপাসনা করিতে অনুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিতেন না।'[৬]

অদ্ভুত নিত্যানন্দ-জীবনে কোন কোন বিষয়ে আবাল্য একই রকম আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যকালে তিনি জন্মস্থানের সন্নিকটে মৌড়েশ্বর বা ময়ূরেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। আবার পরিণত বয়সেও—

রুদ্রাক্ষ বিরাল-অক্ষ সুবর্ণরজতে।
বান্ধিয়া ধরিলা কণ্ঠে মহেশের প্রীতে॥ [ভা ৩।৫]

শিবপ্রীতির ন্যায় শক্তি-প্রীতিও তাঁহাতে সমভাবে বিদ্যমান ছিল। তাহা ছাড়া, সমাজ-নিরপেক্ষ থাকিয়া আজীবন তিনি সিদ্ধকৌলবৎ স্বতন্ত্র আচরণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন : 'মৎস্য খায় মাংস খায় কেমত সন্ন্যাসী।' [ভা ২।২৪] এইসকল কারণেই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে একখানি সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ নিত্যানন্দ-জীবনী লিখিত হয় নাই ?

শ্রীমন্নিত্যানন্দের শক্তিপূজার ধারাটি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও আজ পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, ঐ বংশে এখনও শক্তি-মন্ত্রের উপাসক আছেন।[৭]

---

৬ বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম।

৭ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে :

১। নবদ্বীপের প্রাচীন শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সেবকেরা পুরুষানুক্রমে শক্তিমন্ত্রের উপাসক। উঁহারা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একমাত্র ভ্রাতা যাদব মিশ্রের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচিত করেন, এবং দেবী স্বয়ং অনুজকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যের শক্তি-প্রীতির কতিপয় দৃষ্টান্ত

শ্রীচৈতন্য শাক্ত মনোভাবের অনুকূল পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন লোকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে' এবং "বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা উপহারে।' [ভা ১।২] মুকুন্দ-সঞ্জয়ের গৃহে যে বড় চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, 'সেই স্থানে চৈতন্যের বিদ্যার সমাজ।' [ভা ১।৭] সেই কালের সকল লোকই কৃষ্ণ ও শক্তির মধ্যে ভেদজ্ঞান করিত না; শ্রীবিশ্বম্ভরের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ নির্ধারণের জন্য 'কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেই ক্ষণে, দুর্গা কৃষ্ণ বলি রাজপণ্ডিত-ভবনে।' [ভা ১।১০] এইসকল কারণে শক্তিদেবতার উপর মহাপ্রভুর বাল্যকাল হইতে প্রীতি থাকাই স্বাভাবিক।

পুরী-যাত্রার পথে মহাপ্রভু যাজপুরে ৺বিরজা দেবী দর্শন করিয়াছিলেন। তদীয় বিশিষ্ট পার্ষদ-ভক্ত শ্রীমুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন ঃ

স জগাম বিরজা-মুখপদ্ম-
দর্শনায় ভগবান্ করুণাব্ধিঃ।
যাং বিলোক্য জগতাং জনুকোটি-
মাত্রমঘং হ্যখিলং প্রজহাতি ॥
তাং বিলোক্য প্রণমন্ সমযাচৎ
প্রেমভক্তিমতুলাং জগদীশঃ। [মু ৩।৬]

শান্তিপুরের অদ্বৈতপ্রভুর বংশধর শ্রীদীননাথ গোস্বামী (পাগলা গোঁসাই শাখা) লেখককে বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে শক্তিমন্ত্রে পূর্ণাভিষিক্ত, এবং শাক্তপরিবারভুক্ত শিষ্যদিগকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া থাকেন।

২। অদ্বৈতপ্রভুর বংশধরগণ প্রায় সকলেই শারদীয় দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। দীপান্বিতা অমাবস্যায় কাহারও কাহারও বাড়ীতে শ্যামাপূজাও অনুষ্ঠিত হয়। ৺মদনগোপালের সেবক গোস্বামিগণ নৈমিত্তিক কালীপূজা করেন। মদনগোপালের মন্দিরে 'ভূতনাথ' শিব ও মঙ্গলচণ্ডী নিত্য পূজা পাইতেছেন। এই বিষয়ে খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সঙ্গে সমতা অনুধাবনযোগ্য।

যাঁহাকে দর্শন করিয়া লোকে কোটিজন্মের সমুদয় পাপ নিশ্চিতরূপে পরিহার করে, করুণাব্ধি ভগবান্ সেই ৺বিরজার মুখপদ্ম দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া জগদীশ অতুলা প্রেমভক্তি যাচ্ঞা করিলেন।

বিরজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন :

জগাম বিরজাং দ্রষ্টুং সর্বলোকৈকপাবনীম্।
যাং দৃষ্ট্বা শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ॥
ভগবদ্দর্শনে যাদৃক্ ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
তাদৃক্ ফলমবাপ্নোতি বিরজামুখদর্শনে॥
যত্রাস্তি ভগবান্ দেবঃ সাক্ষাৎ শ্রীমন্ত্রিলোচনঃ।
কাশ্যাং বা বিরজায়াং বা মৃতির্মোক্ষপ্রদায়িনী॥ [মু ৩।৭]

যাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে দর্শন করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সেই সর্বলোকৈকপাবনী বিরজাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ভগবানকে দর্শন করিয়া মানুষ যে ফল লাভ করে, [ভগবতী] বিরজার মুখদর্শন করিলেও সেই ফল পায়। যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীত্রিলোচনদেব আছেন সেই কাশীতে বা বিরজাক্ষেত্রে মৃত্যু মোক্ষদায়ক।

দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য এইসকল শক্তিদেবতাকেও দর্শন করিয়াছিলেন : শিয়ালী-ভৈরবী, কন্যাকুমারী, ক্ষীরভগবতী, চোরা-ভগবতী।। [চ ২।৯]

'গোবিন্দদাসের করচা' বলিয়া কথিত পুস্তিকায় আছে :

পদ্মকোটে দেবী অষ্টভুজা ভগবতী।
সেইখানে প্রভু গিয়া করিলা প্রণতি॥

৩। নিত্যানন্দপুরে (বর্ধমান) ৺মদনগোপালের প্রাচীন মন্দিরে রক্ষিত সুপ্রাচীন হস্তলিখিত চণ্ডীর নিত্য পূজা হয় এবং দুর্গাপূজার তিনদিন ঐ পুস্তকেই বিশেষ পূজাদি হইয়া থাকে।

বহু স্তুতি কৈলা তবে মোর গোরা রায়।

... ...

ক্রমে ক্রমে সুরথের রাজ্যে চলি যায়।
অষ্টভুজা দেখি প্রভু ধরণী লুটায় ॥
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিয়া নয়নে।
তিনদিন বাস করে প্রভু সেইখানে ॥

অধিকাংশ সাহিত্যিকের মতে গোবিন্দদাসের করচা প্রামাণিক গ্রন্থ নহে, আমাদের মতেও নহে। তাহা হইলেও, ইদানীন্তন কালেও যে কোন কোন বিশিষ্ট গোস্বামি-সন্তান শ্রীচৈতন্যের ঐরূপ দেবী-ভক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন, উদ্ধৃত অংশ তাহারই নিদর্শন।

যাঁহার ঈদৃশ দেবী-ভক্তি, তিনি পুরীতে আঠারো বৎসর এবং কাশীতে দুইবার প্রায় আড়াই মাস বাস করিলেও ৺বিমলা ও ৺অন্নপূর্ণা দেবীকে দর্শনাদি করেন নাই, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। ঐ দুই শক্তি-মহাপীঠের সঙ্গে তাঁহার সাধনা সংযুক্ত থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-লীলা-গ্রন্থসমূহে তাহার কোন বর্ণনা তো নাই-ই, ঐ দেবীদ্বয়ের নাম পর্যন্ত ঐসকল পুস্তকে পাওয়া যায় না। প্রকৃত ঘটনা এখন অতীতের অন্ধকারে।

বৈষ্ণবগণের আপত্তির উত্তর

শ্রীজীবগোস্বামী ব্রহ্মসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়ের ৩।৪ শ্লোকের টীকায় গৌতমীয়কল্পের এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন :

যঃ কৃষ্ণঃ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।
অনয়োরন্তরাদর্শী সংসারান্ন বিমুচ্যতে ॥

যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা, যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ; ইঁহাদের মধ্যে যে ভেদ দেখে সে সংসার হইতে মুক্ত হয় না।

সমুদয় কৃষ্ণমন্ত্রের ও বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দুর্গা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীদুর্গা অভেদ ; যিনি মহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই মহেশ্বরী শ্রীদুর্গা।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই সিদ্ধান্তের উত্তরে বলিয়া থাকেন :

শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীদুর্গা একথা ঠিক। এই দুর্গা যোগমায়া। যোগমায়া শ্রীরাধা প্রভৃতির ন্যায় শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি। তিনি প্রকট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপরিকরগণের মুগ্ধত্ব জন্মাইয়া এবং অঘটন ঘটাইয়া সহায়তা করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তি ভগবানের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু তোমরা যে শক্তির কথা বল, এবং কালী-তারাদি বিগ্রহে যাঁহার উপাসনা কর, তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি ; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কর্মক্ষেত্র। তিনি জীবের স্বরূপজ্ঞানকে আবৃত করিয়া মায়িক বস্তুতে তাহাকে মোহিত করিয়া রাখেন। মায়াশক্তি ঈশ্বরের সমীপে যাইতে পারেন না ; এবং মায়াশক্তির আরাধনায় জাগতিক ঐশ্বর্য ব্যতীত পারমার্থিক বস্তু লাভ হয় না।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিজনিত ও শাস্ত্রসিদ্ধ সহজ সরল উক্তিমুখে এই আপত্তির উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের খুল্লতাতপুত্র শ্রীরামতারক ওরফে হলধারী কিছুদিন দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মা-ভবতারিণীর সেবাপূজা করিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত লোক ও নিষ্ঠাবান সাধক ছিলেন. এবং বিষ্ণুপূজায় অধিক প্রীতি থাকিলেও শক্তির উপরে তাঁহার দ্বেষ ছিল না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু দেবীকে পশুবলি দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না এবং যে যে দিনে পশুবলি বিহিত, সেই সেই দিনে তিনি প্রসন্নমনে পূজা করিতে পারিতেন না। মাসেক কাল এইভাবে কাটিবার পর সন্ধ্যা করিতে বসিয়া হলধারী দেখিলেন : দেবী ভয়ঙ্করী মূর্তিতে তাঁহাকে বলিতেছেন, 'আমার পূজা তোকে করতে হবে না ; করলে সেবাপরাধে তোর ছেলের মৃত্যু হবে।' মাথার খেয়াল মনে করিয়া হলধারী ঐ কথা গ্রাহ্য করিলেন না ; কিন্তু

কিছুকাল পরে সত্যসত্যই তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ আসিল। তিনি দেবীপূজায় বিরত হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিতে লাগিলেন; এবং একেবারে পাকা ধারণা করিয়া বসিলেন যে, কালী তমোগুণময়ী বা তামসী দেবতা।

ঐ ধারণাবশে তিনি একদিন ঠাকুরকে বলিয়াও বসিলেন, 'তামসী মূর্তির উপাসনায় কখনো আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে পারে কি? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন?' ইষ্টনিন্দা শ্রবণে ঠাকুরের অন্তর ব্যথিত হইল। তিনি কালী-মন্দিরে যাইয়া সাশ্রুনয়নে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা, হলধারী শাস্ত্র-জানা পণ্ডিত, সে তোকে তমোগুণময়ী বলে; তুই কি সত্যিই তাই?' মার মুখে মার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইযা ঠাকুর উল্লাসে হলধারীর কাছে ছুটিয়া গেলেন; এবং ভাবাবেশে তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে কহিলেন, 'তুই মাকে তামসী বলিস? মা কি তামসী? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী!' হলধারীর অন্তশ্চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন, ঠাকুরের মধ্যে জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দান করিলেন।

'ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী' বলাতে কালী একাধারে বৈষ্ণবগণের কথিত স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তি উভয়ই—বুঝা যাইতেছে। তিনি ত্রিগুণে মোহিত করেন সত্য, কিন্তু শুদ্ধসত্ত্বগুণে বন্ধন খুলিয়াও দেন —স্বয়ং সাধকের ইষ্টমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে কৃতকৃতার্থ করেন।[৮] এখানে একথাও বলা প্রয়োজন যে, শক্তি-তন্ত্র কালী-তারাদি দশ মহাবিদ্যা এবং দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি ইষ্টরূপে আরাধ্য মূর্তিসকলের মধ্যে ভাবের কিছু কিছু পার্থক্য স্বীকার করিলেও, স্বরূপ-

---

৮। সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥—চণ্ডী

গত কোন পার্থক্যই স্বীকার করে না। চিচ্ছক্তি দুর্গা ও 'মায়াংশভূতা দুর্গা' নামে দুই দুর্গার অস্তিত্ব কল্পনায় থাকিলেও কার্যতঃ দুই দুর্গার উপাসনা কোথাও প্রচলিত নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের বাড়ীতে একই মন্ত্রে একই দক্ষযজ্ঞবিনাশিনীর অর্চনা হইয়া থাকে। তিনি প্রহরণধারিণী ও অসুরবিমর্দিনী। তিনিই ব্রজের কাত্যায়নী বলিয়া কথিত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখন কখন মা-কালীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, 'মা, তুমিই ব্রজের কাত্যায়নী।'

শ্রীরাধা সম্বন্ধেও উপর্যুক্ত উভয়বিধ ধারণাই শাস্ত্রসিদ্ধ।[৯] ঠাকুরের উক্তি: 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি—চিচ্ছক্তি, আদ্যাশক্তি। রাধা প্রকৃতি, ত্রিগুণময়ী। এঁর ভিতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। যেমন পেঁয়াজ ছাড়িয়ে যাও, প্রথমে লালকালোর আমেজ, তারপর লাল, তারপর শাদা বেরুতে থাকে।' [ক ২।১৯।২]

শ্রীরাধার একটি প্রসিদ্ধ প্রণামমন্ত্রে আছে, 'বন্দে রাধাং জগৎপ্রসূম্।' জগৎপ্রসূ প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী।

অন্যত্র ঠাকুর বলিতেছেন: 'রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না? রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়ী। যোগমায়ার ভিতরে তিনগুণই আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধসত্ত্ব বই আর কিছুই নাই। [ক ৩।১৭।২] বৃন্দাবনে প্রেমলীলা-বিস্তারিণী রাধা শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী।

ঠাকুর যোগমায়াকে ত্রিগুণাত্মিকা বলায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যোগমায়া সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যে সার্বজনীন নহে, তাহাই বুঝা যাইতেছে।

অবতার-লীলায় যোগমায়া অঘটন ঘটাইয়া থাকেন। এই বিষয়ে ঠাকুরের উক্তি বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-সম্মত। বলিয়াছেন: 'হরিলীলা সব যোগমায়ার সাহায্যে।' 'যোগমায়ার আকর্ষণ ভেল্‌কি লাগিয়ে দেয়। রাধিকা সুবল-বেশে—বাছুর কোলে—জটিলার ভয়ে যাচ্ছে; যখন

৯ দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্বর্গপ্রসাধনী।—নারদপঞ্চরাত্র ৫।৫

যোগমায়ার শরণাগত হলো তখন জটিলা আবার আশীর্বাদ করে।' [ক ৪।২০।১]

শক্তি-সাধক সকাম হইলে জাগতিক ঐশ্বর্য লাভ করেন, ইহা সত্য কথা। কিন্তু ক্রমে ঐ ঐশ্বর্যের মোহ কাটাইয়া পারমার্থিক ঐশ্বর্য বা জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যও লাভ করেন। দেবী-ভক্ত যোগ ও ভোগ দুই-ই প্রাপ্ত হয়, ঠাকুর বলিতেন। ভোগান্তে ব্যাকুল করিয়া পরিপূর্ণ যোগে লইয়া যাইবার জন্য স্বয়ং জগদম্বাই ঐ ভোগের বিধান করিয়া থাকেন।

কোনও কালেই ভোগলেশ-সম্বন্ধহীন যোগের অধিকারী বহুলোক পৃথিবীতে দেখা যায় না। যে যে ধর্মে তাই কেবল যোগেরই বিধান সেই সেই ধর্ম বা ধর্ম-সম্প্রদায়ই ক্রমে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া ধর্মের নামে অধর্মের, নিবৃত্তির নামে প্রবৃত্তির চরম খেলা দেখাইয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ও জাতিকে তামসিকতার অতল গহ্বরে লইয়া গিয়াছে। শক্তিতন্ত্রে যদি যোগ ও ভোগ দুইয়েরই বিধান থাকে, তাহা দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকরই বলিতে হইবে। বেদেও অনুরূপ বিধান দেখা যায়।

উপসংহার

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের শক্তি-সাধনা-ব্যপদেশে যে শক্তি-তত্ত্ব আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ও তৎকর্তৃক গীত একটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া তাহার উপসংহার করিতেছি:

তার তারিণি! এবার তার ত্বরিত করিয়ে,
তপন-তনয়-ত্রাসে ত্রাসিত, প্রাণ যায়।
জগত-অম্বে জনপালিনী, জনমোহিনী জগতজননী;
যশোদা-জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরিলীলায়॥

বৃন্দাবনে রাধা বিনোদিনী, ব্রজবল্লভ-বিহারকারিণী,
রাসরঙ্গিণী রসময়ী হয়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ।
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গঙ্গা গতিদায়িনী,
গান্ধর্বিকা গৌরবরণী, গাওয়ে গোলোকে গুণ তোমার ॥
শিবা সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী সর্বস্বরূপিণী,
সগুণা নির্গুণা সদাশিবপ্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার ॥

চতুর্থ অধ্যায়

শিব ও রামের ভজনা

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন: শিবের দুই অবস্থা। যখন আত্মারাম তখন সোঽহং অবস্থা—যোগেতে সব স্থির। যখন 'আমি' একটি আলাদা বোধ থাকে তখন 'রাম রাম' করে নৃত্য। [ক ৪।২৩।৮]

তিনি আরও বলিতেন, 'শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব।' শিবই কেবল রামের ভজনা করেন না, রামও শিবের ভজনা করেন। রাম তাঁহার শিব-ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন সেতুবন্ধে স্বনামে ৺রামেশ্বর-শিব স্থাপনা করিয়া। জগদ্‌গুরু ঈশ্বর একরূপে স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া নিজেরই অন্যরূপের আরাধনা কিরূপে করিতে হইবে তাহা জীবকে শিখাইয়া থাকেন: ঠাকুরের উক্তি হইতে আমাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মে।

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই বিভিন্ন সময়ে শিবের ও রামের ভজনা করিয়াছেন, লীলাগ্রন্থসমূহ হইতে জানিতে পারা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিব-ভজনা

বাল্যকাল হইতেই শ্রীগদাধর বিভিন্ন দেবদেবীর উপর ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন, ঐসকল দেবতার মহিমাসূচক বহু গান ও গানের পালা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অভিনয়-কালে সেই সেই দেবতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া এই বয়সেই কখন কখন তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্ত হইত।

কামারপুকুরে পাইনদের বাড়ীতে শিবরাত্রি উপলক্ষে যাত্রাগান হইবার কথা ছিল। শিবমহিমাসূচক পালা, কিন্তু যাত্রার দলে যে শিব সাজে, তাহারই সহসা অসুখ হওয়ায় সমস্ত পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে।

গ্রামের লোকেরা পরামর্শ করিয়া শ্রীগদাধরকেই শিবের ভূমিকা অভিনয় করিতে বলিল। কেন না, বয়স অল্প হইলেও তাঁহার অভিনয়দক্ষতা আছে, এবং শিব সাজিলে সুঠাম সুগৌর শরীরে তাঁহাকে মানাইবেও ভাল।

শিব সাজিয়া, সাজঘরে বসিয়া শিবচিন্তা করিতে করিতে শ্রীগদাধর পূর্বেই কেমন ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, যখন সহচরচালিত হইয়া আসরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, "সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা" [লী ৩।২] সাক্ষাৎ ত্রিলোচনকে প্রত্যক্ষ করাইয়া সকলকে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত করিল। পুরুষেরা হরিধ্বনি করিয়া উঠিল; মেয়েরা উলুধ্বনি ও কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল; এবং যাত্রার অধিকারী সুরসংযোগে শিবস্তুতি গাহিতে লাগিলেন। শিবরূপী শ্রীগদাধর একই ভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া—সেই রাত্রে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসিল না।

ঠাকুরের সাধনার অবস্থা। নবানুরাগের ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া একদিন 'শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্' পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

সমুদ্ররূপ মসীপাত্রে নীলপর্বততুল্য কাজল, কল্পতরু পারিজাতের শ্রেষ্ঠশাখা লেখনী, এবং পৃথিবী লিখিবার পত্রস্বরূপ যদি হয়, আর যদি এই সমস্ত উপকরণ লইয়া সরস্বতী সর্বকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন, তাহা হইলেও, হে ঈশ! তিনি তোমার গুণের পার পান না।

এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিবামাত্র তাঁহার এক অপূর্বভাবের উদয় হইল। 'মহাদেব গো, তোমার গুণের কথা কেমন করে বলব'— চীৎকার করিয়া বারবার ঐ কথাই বলেন, আর দরদরিতধারে অশ্রু ঝরিয়া, কপোল ও বক্ষ বাহিয়া মন্দিরতল সিক্ত করে। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে তিনি শান্ত হইলেন ও ক্রমে তাঁহার বাহ্য-জগতের হুঁস ফিরিয়া আসিল।

তীর্থভ্রমণ-কালে শ্রীবৃন্দাবন পর্যন্ত যাতায়াতের পথে, ঠাকুর দুইবারে কয়েক মাস কাশীতে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে প্রায় প্রত্যহ পাল্‌কিতে চাপিয়া ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেন এবং যাইতে যাইতে পথেই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।

মণিকর্ণিকা-ঘাটের শ্মশানে তিনি বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন— পিঙ্গলজটাধারী দীর্ঘাকার শ্বেতকায় পুরুষ, যেন জগতের যত গাম্ভীর্য লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! সেই পুরুষ পরে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া যান।

একদিন প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া শ্রীনীলকণ্ঠের 'শিব শিব' গান শুনিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের শিব-ভজনা

নবদ্বীপে মহাপ্রভুর গৃহে একদিন এক 'শিবের গায়ন' আসিল এবং ডমরু বাজাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্য করিতে করিতে শিবগাথা গাহিতে আরম্ভ করিল। শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভু শিবের ভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং নাচিতে নাচিতে সহসা গায়কের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া 'হুঙ্কার করিয়া বোলে মুঞি সে শঙ্কর।' [ভা ২।৮] তখন শ্রীবাস পণ্ডিত শিবস্তোত্র ও অতিসুকণ্ঠ মুকুন্দ 'মহিম্নঃ স্তোত্র' আবৃত্তি করিতে

লাগিলেন। [মু ২।১১] এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পদকর্তা নরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন ঃ

আজু শঙ্করচরিত শুনি শচীতনয় শঙ্কর ভেল।
রজতগিরি জিতি জ্যোতি ডগমগ, জগতধৃতি হরি নেল ॥[১]

মহাপ্রভু একএক সময়ে শিবনাম গাহিয়া নৃত্য করিতেন। বৃন্দাবন-দাস লিখিয়াছেন ঃ

শিব শিব নাচে বিশ্বম্ভর।
অতি সুমঙ্গলং শিবশিবোচ্চারণম্ ॥ [ভা ২।২৩]

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু রাঢ়দেশে প্রবেশ করিয়া একবার বক্রেশ্বর শিবের স্থানে বাস করিতে চাহিয়াছিলেন ; ইহা তাঁহার শিবপ্রীতিরই নিদর্শন।

প্রভু বোলে—বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জনে ॥ [ভা ৩।১]

পুরী গমনের পথে তিনি জলেশ্বর, কপোতেশ্বর ও ভুবনেশ্বর শিব দর্শনাদি করিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন।

'শিব রাম গোবিন্দ' বলিয়া গৌররায়।
হাথে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥ [ভা ৩।২]

বৃন্দাবনদাস ঐসকল স্থলে শিবকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং ভক্তের ঐশ্বর্য দেখিয়া ও ভক্তের মহিমা বাড়াইতেই তিনি ঐরূপ পূজা ও নৃত্য করিয়াছিলেন, বলিয়াছেন। কিন্তু মুরারি-গুপ্ত

১ ভক্তিরত্নাকর, ১২শ তরঙ্গ।

ও লোচনদাসের বর্ণনা পড়িয়া, পরমেশ্বর-বুদ্ধিতেই যে তিনি শিবপূজাদি করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। মুরারির অনুগামী হইয়া লোচনদাস লিখিয়াছেন ঃ ভুবনেশ্বরে—

মহেশ দেখিয়া প্রভুর আবেশ শরীর।
টলমল করে তনু—নাহি রহে স্থির॥
অরুণ নয়নে জল ঝরে অনিবার।
পুলকিত অঙ্গ—স্তব পড়ে অনিবার॥
... ...
এইমতে মহাপ্রভু পড়ে শিবস্তব।
চৌদিকে স্তব পড়ে সকল বৈষ্ণব॥

শিব নমস্করি প্রভু বাহিরে আসিয়া।
বিশ্রাম করিলা এক গৃহে প্রবেশিয়া॥
ভক্তনিবেদিত অন্ন ভোজন করিলা।
পথের আয়াসে নিশি শুতিয়া রহিলা॥
শয়নসময়ে কৃষ্ণপদাম্বুজ ধ্যান।
হেনকালে করয়ে হৃদয়ে অনুমান॥
শিব-মহাপ্রসাদ পাইয়ে ভাগ্যবশে।
ভক্ষণ করিয়ে হেন আছে প্রতিআশে॥
এই মনে মহাপ্রভু অনুমান-কালে।
'পানা-পরসাদ লহ'—একজন বোলে।
উঠিয়া প্রসাদ পানা লইলা ঠাকুর।
পানা-পান করি সুখ বাড়িল প্রচুর॥
নিজজনে দিল যে আছিল অবশেষ।

ভক্তের প্রসাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ভগবানের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ। সম্ভবতঃ এই কারণেই, মহাপ্রভু যে একান্তভক্তির সহিত মহাদেবের প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন।

ঐসকল শিবস্থানে মহাপ্রভুর ভক্তি দেখিয়া শৈবগণ আপন আপন ধর্মে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। এমনকি, কেহ কেহ মহাপ্রভুকেই সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিয়াছিলেন। যেমন জলেশ্বরে—'সভেই বোলেন, শিব হইলা বিদিত।' [ভা ৩।২] এইসকল স্থানে মহাপ্রভুর শৈবগণকে বৈষ্ণব করিবার কথা কেহই লিখেন নাই; অথচ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-কালে নাকি তিনি—'সব শিবালয়ে শৈব বৈষ্ণব করিল।' [চ ২।৯] এইরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, মহাপ্রভুর অলৌকিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রকৃত শৈবভক্তগণ হরিহর অভিন্ন জানিয়া কৃষ্ণবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[২]

পুরীধামে আসিয়া মহাপ্রভু মার্কণ্ডেয়তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন এবং অঘোর-মন্ত্র জপ করিয়া ৺মার্কণ্ডেয়েশ্বর শিবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়াছিলেন। [মু ৩।১০] দাক্ষিণাত্যে তিনি শিবকাঞ্চী, সেতুবন্ধ ও অন্যান্য স্থানে মহাদেব দর্শনাদি করিয়াছিলেন; এবং কাশীতে অবস্থান-কালে ৺বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইতেন।

---

২ দাক্ষিণাত্যে শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে উৎকট ঘৃণা ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-গমনের প্রায় চারিশত বৎসর পরে সেই বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখিয়াছেন: "দাক্ষিণাত্যে শৈব-বৈষ্ণবের নিত্য কলহ। বৈষ্ণব দর্শন বা সম্ভাষণ করিলে শৈব স্নান করিয়া আপনাকে শুদ্ধ জ্ঞান করেন। বৈষ্ণবেরও ঐ রীতি। ...ধাবমান মত্তহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ, কিন্তু পার্শ্ববর্তী শিবমন্দিরে আশ্রয়-গ্রহণপূর্বক প্রাণরক্ষা করা বৈষ্ণবোচিত কর্ম নহে, ইহাই দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বৈষ্ণবের ধারণা।"—শ্রীরামানুজচরিত, ১৪শ অধ্যায়। সাম্প্রদায়িকতার এইরূপ কুফল দেখিয়াই কি গৌড়ীয় বৈষ্ণব হরিহরের ভেদদর্শনকে অপরাধ গণ্য করিয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণের রাম-ভজনা

ঠাকুরের পিতা শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায় পরম রামভক্ত ও রামমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। ভক্তিবলে 'রঘুবীর' শিলা প্রাপ্ত হইয়া তিনি ঐ শিলা নিজের গৃহদেবতারূপে স্থাপনা করেন। উপনয়নের পর শ্রীগদাধর অনেক কাল রঘুবীরের পূজাদি করিয়াছিলেন। সহজেই তাঁহার চিত্ত শ্রীরামচন্দ্রে আকৃষ্ট হয়; এবং মহাবীর হনুমানের ভাবে দাস্যভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করেন।

ঐ সাধনকালে মহাবীরের চিন্তায় ঠাকুর এতই তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আহার-বিহারাদি সমস্তই হনুমানের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। শ্রীমুখে বলিয়াছেন: "পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম, এবং নিরন্তর 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীরস্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুর্দ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চলভাব ধারণ করিয়াছিল এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।" [লী ৩।৮]

এইকালে তিনি একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়, সাদাচোখে মা-সীতার দর্শন লাভ করেন: প্রেম, করুণা ও সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, নিরুপমা দেবী-মানবী—তাঁহার নয়নে সুপ্রসন্ন দৃষ্টি ও মুখে অতিকমনীয় অপূর্ব সুধাহাসি। ধীরমন্থরপদে নিকটে আসিয়া সেই মূর্তি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হন ও তিনি বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া যান।

ঠাকুর পরে বাৎসল্যভাবেও শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন; সেকথা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা যাইবে।

স্বয়ং প্রার্থনা করিয়া ঠাকুর ভক্তগণকে এইরূপে প্রার্থনা করিতে শিখাইয়াছেন: 'ও রাম! ও রাম! আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন,

ভক্তিহীন—আমি ক্রিয়াহীন। রাম শরণাগত! ও রাম শরণাগত! দেহসুখ চাইনে রাম! লোকমান্য চাইনে রাম! অষ্টসিদ্ধি চাইনে রাম! শতসিদ্ধি চাইনে রাম! শরণাগত, শরণাগত, কেবল এই করো—যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি হয় রাম! আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হই না রাম! ও রাম, শরণাগত!' [ক ২।১৬।২]

রামাৎ-সাধুগণের নিকট শুনিয়া ঠাকুর অনেক রাম-ভজন শিখিয়াছিলেন ও কখন কখন স্বীয় ভক্তদিগকে গাহিয়া শুনাইতেন।

শ্রীচৈতন্যের রাম-ভজনা

মহাপ্রভু স্বয়ং দাস্যভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া জীবকে উহা করিতে শিখাইয়াছেন। দাস্যভাবে ভক্তগণের—

নিঙ্গাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে।
ধুতি-বস্ত্র তুলি কারো দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গা-মৃত্তিকা কাহারো দেন করে।
সাজি বহি কোনো দিন চলে কারো ঘরে॥ [ভা ২।২]

'দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন ক্রন্দন, হইল প্রহর দুই গঙ্গা আগমন' [ভা ২।৩], কিংবা 'বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন, দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ-সেবন' [ভা ২।৮] ইত্যাদি কথা তাঁহার দাস্যভাবে সাধনার ইঙ্গিত দান করে। 'ক্ষণে বোলে—মুই কৃষ্ণদাস সর্বকাল' [ভা ২।২৪] —একথা তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে দাস্যভক্তির পরিচায়ক।

মহাপ্রভুর শ্রীরামচন্দ্রেও যে দাস্যভক্তি—মহাবীর হনুমানের ভাবানুগা দাস্যভক্তি ছিল, নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা জানিতে পারা যায়। পুরীতে—

বিজয়া দশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে।
বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে॥

হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া।
লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া॥
'কাঁহা রে রাবণা!' প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
'জগন্মাতা হরে পাপী, মারিমু সবংশে'॥ [চ ২।১৫]

মহাপ্রভুর পিতা শ্রীজগন্নাথমিশ্রও ঠাকুরের পিতার ন্যায় পরম রামভক্ত ছিলেন। তাঁহার অন্তিমকালে, জাহ্নবীতীরে শ্রীবিশ্বম্ভর যখন পিতার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন, 'বাবা, তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছ?' তখন জগন্নাথ পুত্রকে প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'রঘুনাথ-চরণে সঁপিনু মুঞি তোমা।' [ম ২, মু ১।৮]

নবদ্বীপে মহাপ্রভু যে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক পদেই কৃষ্ণ-নামের সঙ্গে রাম-নাম পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য-পর্যটন-কালে তিনি প্রেমাবেশে এইরূপ নামকীর্তন করিতে করিতে পথ চলিতেন:

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং!
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং!

আমরা জানি, সম্প্রদায়ানুবোধে কোথাও কোথাও—যেমন, তারক-ব্রহ্ম-নামে—'রাম' শব্দে 'কৃষ্ণ' প্রতিপাদন করা হয়। উপর্যুক্ত স্থলে 'রাম' নামের সঙ্গে 'রাঘব' নাম যুক্ত থাকায় সেই অর্থ করার কোনই সম্ভাবনা নাই; এবং মহাপ্রভু যে রাম ও কৃষ্ণকে একই পরমপুরুষ বলিয়া জানিতেন, সহজবুদ্ধিতে তাহাই প্রতিভাত হয়।

শ্রীচৈতন্যের বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমুরারি-গুপ্ত রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। তাঁহার মুখে 'রামাষ্টক' শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে তাঁহার মস্তকে শ্রীপদ স্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন:

শুন গুপ্ত, এই তুমি আমার প্রসাদে।
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্বিরোধে॥

ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহো রাম-পদাম্বুজ পাইবে নিশ্চয়॥ [ভা ৩।৪]

রূপ-সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের মৃত্যু-সংবাদে মহাপ্রভু তাঁহার প্রশংসা করিয়া শ্রীসনাতনকে বলিয়াছিলেন ঃ

তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি।
ভাল ছিল, রঘুনাথে দৃঢ় তার ভক্তি॥ [চ ৩।৪]

ইহার পরেও যদি কেহ বলেন ঃ দাক্ষিণাত্যে—

বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব॥
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে।
কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে॥ [চ ২।৯]

তবে সেইসব বৈষ্ণবের কৃষ্ণোপাসনা ইষ্টোপাসনার সঙ্গে অভেদে সমন্বিত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাৎসল্য-ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণ বাৎসল্য-ভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যও যে করিয়াছিলেন তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা হইতে বুঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি হইতেও অনুমিত হয়। প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ ও সিদ্ধের সিদ্ধ—এই চারিটি সাধকজীবনের ক্রমপরিণতির সূচক অবস্থাভেদ বুঝাইতে গিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'সিদ্ধের সিদ্ধ, যেমন চৈতন্যদেবের অবস্থা—কখনও বাৎসল্য, কখনও মধুর ভাব।' ক ৪।৭।২।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্য-ভাব

ঠাকুরের বিবিধ তান্ত্রিক সাধনা তখন শেষ হইয়াছে। ইতঃপূর্বে দাস্য ও সখ্যভাবের সাধনাও হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন নিজেকে জগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী দাসী বা সখী জ্ঞান করিয়া প্রকৃতিভাবে তন্ময়। এমন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে 'জটাধারী' নামক সিদ্ধ রামাৎ সাধুর আগমন হইল। জটাধারী বাৎসল্যভাবে 'রামলালা' বা রামচন্দ্রের বালগোপাল-মূর্তির সেবা করিতেন। তাঁহার কাছে বসিয়া ঠাকুর একদৃষ্টে তাঁহার বিগ্রহসেবা লক্ষ্য করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—রামলালা সত্যসত্যই খায়, এটাসেটা খাইতে চায়, আবদার করে, সঙ্গে বেড়াইতে যায়! আর বাবাজী চব্বিশ ঘণ্টাই সেই ঠাকুর লইয়া 'মস্ত' বা আনন্দে বিভোর। সহজেই রামলালার উপরে ঠাকুরেরও বাৎসল্যভাবের উদয় হইল। তিনি ঐ ভাব সাধনার মানসে বাবাজীর নিকট রামমন্ত্র গ্রহণ করিলেন।

রামলালার প্রীতিও ক্রমে বাবাজীকে ছাড়াইয়া ঠাকুরের উপরেই অধিক হইতে লাগিল। যতক্ষণ ঠাকুর বাবাজীর কাছে থাকেন, সে

বেশ থাকে, খেলাধূলা করে ; আর যেই তিনি নিজের ঘরে চলিয়া আসেন, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসে—নিষেধ করিলেও শুনে না। এইভাবে কিছুদিন যায়। একদিন বাবাজী হঠাৎ আসিয়া অশ্রুসিক্তচক্ষে ঠাকুরকে কহিলেন, 'রামলালা আমাকে প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দেখা দিয়াছে ও বলিয়াছে, তোমার নিকট হইতে যাইবে না। এখন আমার অবস্থা এমন হইয়াছে যে রামলালার যাহাতে সুখ, আমারও তাহাতেই সুখ। তোমার কাছে সে সুখে আছে ভাবিয়া সেই ধ্যান করিয়াই আমার আনন্দ হইবে।' জটাধারী ঠাকুরকে রামলালা-বিগ্রহ দিয়া চলিয়া গেলেন। রামলালাকে লইয়া ঠাকুরের বাৎসল্য-রসের অনন্ত লীলা-তরঙ্গ-তুফান বহিল।

রামচন্দ্রের বালগোপাল-মূর্তির অবিচ্ছিন্ন দিব্যদর্শন লাভে সমর্থ হইয়া ঠাকুর অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন :

যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট্‌ঘট্‌মে লেটা,
ওহি রাম জগৎ পশেরা,
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা ॥

ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল-মূর্তিতেও বাৎসল্যভাব আরোপ করিয়া এইরূপে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের সাক্ষাতে একদিন মধুরকণ্ঠে হরিনাম করিতে করিতে বলিতেছেন : 'ওমা! ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে বেহুঁস করে রাখিস নে। ব্রহ্মজ্ঞান চাই না মা! আমি আনন্দ করবো! বিলাস করবো!···

'কৃষ্ণ রে! তোরে বলবো, খা রে—নে রে বাপ! কৃষ্ণ রে! বলবো, তুই আমার জন্য দেহ ধারণ করে এসেচিস বাপ!' [ক ৪।৯।১]

নরলীলায় ঠাকুরের এই বাৎসল্যরসের সম্ভোগ পরবর্তী কালে দেখা দিয়াছিল শ্রীরাখালচন্দ্র বা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লইয়া। রাখালকে তিনি

পূর্বাবতারে ব্রজের রাখাল বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ১৯।২০ বৎসরের যুবক ঠাকুরকে দেখিয়া অপূর্ব বালকভাবে আবিষ্ট হইতেন এবং তাঁহার কোলে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে স্তন্যপান করিতেন।

শ্রীচৈতন্যের বাৎসল্য-ভাব

গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাইয়া শ্রীবিশ্বম্ভর সন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর দেখা পাইলেন, এবং সেবায় পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার কাছে মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন।

পুরী বোলে—মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বথা॥
তবে তান স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ॥

৺গদাধর-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া শ্রীবিশ্বম্ভর পূর্বেই প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন, দীক্ষা গ্রহণের পর হইতে তাঁহার ব্যাকুলতা তীব্রভাবে প্রকাশ পাইতে লাগিল। গয়াধামে—

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
'কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি।
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি॥
পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিগে গেলা।'
শ্লোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা॥
প্রেমভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥

আর্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে।
'কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহরে'॥
যে প্রভু আছিলা অতি পরম গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম অস্থির॥

সঙ্গী ছাত্রগণ তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন :

···তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার-ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে মুঞি চলিব সর্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা॥

রাত্রিশেষে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমাবেশে মথুরা যাত্রা করিলেন।

'কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর! পাইমু কোথায়?'
এইমত বলিয়া যায়েন গৌর-রায়॥

খানিকদূর অগ্রসর হইয়া আকাশ-বাণী শুনিতে পাইলেন :

এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি।
যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে।
নবদ্বীপে নিজগৃহে চলহ এখনে॥

আকাশ-বাণী শুনিয়া মহাপ্রভু নিবৃত্ত হইলেন ও শিষ্যগণ সহ নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিলেন। [ভা ১।১২]

মহাপ্রভুর 'কৃষ্ণ রে! বাপ রে মোর!' সম্বোধন কৃষ্ণে বাৎসল্যভাব এবং ঈশ্বরপুরীর কাছে ঐভাবের অনুকূল মন্ত্র-গ্রহণ নির্দেশ করিতেছে। মন্ত্র-গ্রহণের স্বল্পকাল পরে ঐমন্ত্রের ধ্যান হইতেই যে তাঁহার তাদৃশ ব্যাকুলতার প্রকাশ, এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনা অতি স্পষ্ট।

সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য পুরী চলিয়াছেন। দেউলের নিকটবর্তী হইয়া মন্দিরাগ্রে দৃষ্টিপাত করিতেই বালগোপাল-মূর্তি দর্শন করিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন।

প্রাসাদের দিগে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥

... ...

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্তিঃ॥
প্রভু বোলে—দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥
এই শ্লোক পুনঃপুন পড়িয়া পড়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥ [ভা ৩।২]

পার্ষদ ভক্তগণের ভিতর শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির প্রতি মহাপ্রভুর বাৎসল্য বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। নবদ্বীপে বিদ্যানিধিকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তিনি এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন :

পুণ্ডরীক আরে ! মোর বাপ রে ! বন্ধু রে !
কবে তোমা দেখিব, আরে রে বাপ রে ! [ভা ১।৭]

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধুর-ভাব

বাৎসল্য-সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মধুরভাবের সাধনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বিবরণ হইতে শ্রীচৈতন্যও করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ঐ ভাবের সাধনা বলিয়া কোন বর্ণনা নাই। যাহা আছে, এবং অনেকটা বিস্তারিতভাবেই আছে, তাহা মধুররসের আস্বাদন। 'প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদনচ্ছলে।' [চ ১।১৩] এই মধুরভাবের সাধনা বা আস্বাদন কালে মহাপ্রভুর দেহে যেসকল বিকার দৃষ্ট হইত, ঠাকুরের দেহেও সেইসকল বিকার হইতে দেখা গিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধুরভাব-সাধন

মধুরভাব সাধনার কালে ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা ধারণ করিয়াছিলেন এবং নিরন্তর ছয়মাস ঐ বেশে ছিলেন। তাঁহার নিজেকে পুরুষ-বোধ একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল এবং চলন, বলন, কটাক্ষ, হাস্য, অঙ্গভঙ্গী সর্বতোভাবে স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিল। চলিবার সময় বামপদ আগে অগ্রসর হইত। বহুকালের পরিচিত লোকেরাও তাঁহাকে দেখিয়া হঠাৎ চিনিতে বা পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিত না। তাঁহার তন্ত্র-সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাকে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া একএক সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী জ্ঞান করিয়া বসিতেন। রমণী-ভাবের সর্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টিতে এইকালে তাঁহার দেহ স্ত্রীলোকের দেহের ন্যায় মাসে তিনদিন করিয়া পুষ্পিতও হইয়াছে!

এই সময়ে তিনি প্রত্যহ সকালে সাজি-হাতে পুষ্পচয়ন করিতেন এবং স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে মনের মত করিয়া সাজাইতেন। কখনো বা ব্রজের কাত্যায়নী জ্ঞানে মা-ভবতারিণীকে মালা পরাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য হৃদয়ের আকুল আবেগ নিবেদন করিতেন।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমে চিরকালের জন্য আবদ্ধ। ইহা জানিয়া ব্রজগোপীভাবে ভাবিত ঠাকুর শ্রীমতীর স্মরণ মনন ও ধ্যানে তন্ময় হইলেন ; এবং তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে করিতে অচিরেই তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা, নিরুপমা, সকল মহিমা ও মাধুরী মণ্ডিতা, নাগকেশর-পুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণা" সেই মূর্তি তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার নিজাঙ্গে মিলিত হইয়া গেলেন। উহার পর হইতে ঠাকুর নিজেকে স্বয়ং শ্রীমতী বলিয়া জ্ঞান করিতে ও তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় তাঁহাতে মহাভাবের লক্ষণসমূহ প্রকট হইতে আরম্ভ করিল।

দিনের পর যতই দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার প্রার্থনা ততই আকুল ক্রন্দনে ও প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও আচরণে পরিণত হইল। আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল। হৃদয়-মন-মন্থনকারী বিরহের উত্তাপ নিদারুণ শারীরিক জ্বালারূপে দেখা দিল ও শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গমন হইতে লাগিল। দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায় শিথিল মনে হইত এবং কখন কখন মৃতের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকিত!

অবশেষে তিনি সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন ; এবং "নীলবর্ণ ঘাসফুলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট" সেই মূর্তি তাঁহাকে দেখা দিয়া শ্রীমতীর ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইলেন। এই মিলনের পর তাঁহার পৃথগস্তিত্ববোধ তিরোহিত হইল—কখনো নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া

বোধ, কখনো বা 'যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ-স্ফুরণ' হইতে লাগিল। তিনি আব্রহ্মস্তম্ব সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহরূপে দর্শন করিলেন।

এই মধুরভাবের সাধন বা আস্বাদন কালে ঠাকুর অন্যান্য ব্রজগোপীদেরও দর্শন পাইয়াছিলেন। একদিন কাপ্তেন শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের মুখে গোপীগণের কথা শুনিতে শুনিতে সহাস্যে বলিয়াছিলেন, 'গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা এসব হয়েচে!' [ক ৩।১৭।৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের মধুররস আস্বাদন

ঠাকুরের মধুররসের আস্বাদন ভক্তেরা সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু তৎকালে উহা দীর্ঘস্থায়ী হইত না।

এক বৈরাগী গোপীযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের ঘরে গাহিতেছেন :

কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গাল বেশে,
হরি হয়ে বলচ হরি।
কার ভাবে ধরেচ ভাব, এমন স্বভাব,
তাও তো কিছু বুঝতে নারি॥

ঠাকুর গান শুনিতেছেন এমন সময় শ্রীকেদার চাটুয্যে আসিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার অন্তরে গোপীর ভাব। কেদারচন্দ্রকে দেখিয়াই ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ও সম্বোধন করিয়া গান ধরিলেন : 'সখি! সে বন কতদূর? যথা আমার শ্যামসুন্দর। আর চলিতে যে নারি।' শ্রীরাধার ভাবে গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষের দুই কোণ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল। [ক ৪।১।৪]

দক্ষিণেশ্বরে মনোহরসাঁই গোস্বামী ঠাকুর ও ভক্তদিগকে পূর্বরাগ কীর্তন শুনাইতেছেন। 'করতলে হাত, চিন্তিত গোরা—আজ কেন

চিন্তিত ?—বুঝি রাধার ভাবে হয়েছে ভাবিত।' গৌরচন্দ্রিকা শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। গোস্বামী গাহিলেন :

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়।
কিবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়!
(রাই এমন কেন বা হ'লো গো।)

গানের এই আখরটি শুনিয়া ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা হইল। গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কীর্তনীয়া যখন গাহিলেন—

শীতল তছু অঙ্গ। তনু পরশে অমনি অবশ অঙ্গ।

মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতে লাগিল। কেদারচন্দ্রকে দেখিয়া কীর্তনের সুরে বলিতে লাগিলেন : প্রাণনাথ, হৃদয়বল্লভ, তোরা কৃষ্ণ এনে দে, সুহৃদের তো কাজ বটে। হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল্—তোদের চিরদাসী হব। [ক ২।৫।৪]

ভাবাবস্থায় রেলের উপর পড়িয়া গিয়া ঠাকুরের বাঁ হাতের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এই সম্বন্ধে ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন :

তোমাদের অতি গুহ্যকথা বলচি কেন পূর্ণ, নরেন্দ্র, এদের সব এত ভালবাসি। জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল। জানিয়ে দিলে, 'তুমি শরীর ধারণ করেচ—এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এইসব ভাব লয়ে থাকো।' [ক ৪।২৩।৭]

অপ্রকট হওয়ার কয়েক মাস পূর্বে ঠাকুর একদিন একান্তে 'মণি'কে বলিয়াছিলেন, 'তোমায় বলচি—এসব জীবের শুনতে নাই—প্রকৃতিভাবে পুরুষকে (ঈশ্বরকে) আলিঙ্গন চুম্বন করতে ইচ্ছা হয়।' [ক ৪।২৯।১]

শ্রীচৈতন্যের মধুরভাব-সাধন

সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে সম্বৎসর কীর্তনাদিতে অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে তাঁহাতে নানাভাবের আবেশ হইত। সেইসকল আবেশের বিক্ষিপ্ত বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবতের স্থানে স্থানে

পাওয়া যায়। নিম্নোদ্ধৃত স্থলগুলি মধুরভাবাবেশের বা মহাভাবের বর্ণনা বলিয়া সহজেই প্রতীত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-সাদৃশ্যে উহার সঙ্গে সাধনাও অনুমান করা যাইতে পারে। ঠাকুরের মধুরভাব-সাধনাও সন্ন্যাসের পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কোনো দিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বোলে রাত্রি দিন নাহিক স্মরণ॥

... ...

যখনে বা হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সভে 'হরি' বোলে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহাশীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখনো বা হয় অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদভূত বহে মহাশ্বাস।
সম্মুখ ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ॥ [ভা ২।৮]
'গোপী গোপী গোপী' মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জ্বলে মহাকোপে॥
'কোথাকার কৃষ্ণ তোর, মহাদস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কিতব—ভজে বা তারে কে॥
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কাণ।
লুব্ধকের প্রায় লৈল বালির পরাণ॥

কি কার্য আমার সে বা চোরের কথায় ?'
যে 'কৃষ্ণ' বোলয়ে, তারে খেদাড়িয়া যায় ॥
'গোকুল গোকুল' মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে ।
'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বোলে কোন দিনে ॥
'মথুরা মথুরা' কোন দিন বোলে সুখে ।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি ।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥ [ভা ২।১৪]
কখনো বা বিরহ-প্রকাশ হেন হয় ।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেমসিন্ধু যেন বয় ॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন ।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন ॥
আপনার রসে প্রভু আপনি বিহ্বল ।
আপনা পাসরি যেন করেন সকল ॥
পূর্বে যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে ।
পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার ।
কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার ॥ [ভা ২।২৫]

শ্রীচৈতন্যের মধুররস আস্বাদন

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্য সাক্ষাতে তাঁহাকে কোলে করিতে ছুটিয়াছিলেন। পুরীতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই—

দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হুঙ্কার ।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার ॥

লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল
চতুর্দিগে ছুটে সব নয়নের জল ॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত
... ...
বাহ্য না জানিলা তিনপ্রহর দিবস ॥ [ভা ৩৷২]

মহাপ্রভুর মধুররসের আস্বাদন দীর্ঘকালস্থায়ী। অনুভূতির অনুপম ভাষায় তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা হইতে দুইএকটি সংক্ষিপ্ত ঘটনামাত্র গ্রহণ করিয়া উহার আভাস দিতে চেষ্টা করিব। ঐ আস্বাদন সময়ে—

নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ ॥
লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে ॥
গম্ভীরা ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রালব।
ভিতে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব ॥
. .. ...
চটক পর্বত দেখি গোবর্দ্ধন-ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন-জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায়---ক্ষণে মূর্চ্ছা যান ॥
. .. ...
হস্তপাদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম রহে স্থানে ॥



হস্ত-পদ-শির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয়—কূর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা, বাক্য হা-হা-হা-হুতাশ॥
'কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন?
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন?
কাহারে কহিব কে বা জানে মোর দুঃখ?
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক!' [চ ২।২]

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু শান্তিপুরে আসিয়াছেন, শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ঘরে। আচার্যের আনন্দের সীমা নাই। সারাদিন নানাভাবে মহাপ্রভুর সেবা ও সন্তোষবিধান করিয়া সন্ধ্যার পর স্বয়ং কীর্তন আরম্ভ করিলেন:

কি কহিব রে সখি, আজক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

আচার্য নিজানন্দে বিভোর হইয়া গান করেন, নাচেন, হুঙ্কার-গর্জন করেন, আর ফিরিয়া ফিরিয়া মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া—তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন:

অনেকদিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া।
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া॥

এদিকে কীর্তন শুনিতে শুনিতে মহাপ্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল।

প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর, নাহি কৃষ্ণসঙ্গ।
বিরহে বাড়িল প্রেম-জ্বালার তরঙ্গ॥
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা।

মুকুন্দ তাঁহার অন্তর বুঝিয়া ভাবের অনুরূপ পদ গাহিলেন :

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি ! কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জ্বরে ॥
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ ॥

আচার্য মহাপ্রভুকে নৃত্য করিতে উঠাইয়াছিলেন ; এখন তাঁহাকে ধরিয়া রাখা দায় হইল।

অশ্রু-কম্প-পুলক-স্বেদ-গদ্গদবচন।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন ॥
... ...
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে।
ভূমিতে পড়িল, শ্বাস নাহিক শরীরে ॥

মূর্ছাভঙ্গে মহাপ্রভু উদ্দাম নৃত্য করিতে এবং নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া ধরিয়া ফিরিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রহরেক নৃত্যগীতের পর আচার্য কীর্তন সাঙ্গ করিলেন। [চ ২।৩]

পুরীধামে মহাপ্রভু একদিন সমুদ্রতীরে চলিয়াছেন। আচম্বিতে পুষ্পবন দেখিতে পাইয়া তাঁহার বৃন্দাবন বলিয়া ভ্রম জন্মিল। অমনি ছুটিয়া গিয়া সেই বনে প্রবেশ করিলেন ; এবং রাসে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে গোপীগণ যেভাবে তাঁহার বার্তা স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণিমাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ জিজ্ঞাসাচ্ছলে শ্রীমদ্ভাগবতের সেইসব সঙ্গীতময় শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বহু অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে 'যমুনাকূলে কদম্বমূলে' শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাইলেন :

কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন।
অপার সৌন্দর্যে হরে জগন্নেত্র-মন॥

তিনি সৌন্দর্যসাগরে ডুবিয়া গেলেন। দেহখানি ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইল, সর্বাঙ্গে সাত্ত্বিক বিকারসমূহ দেখা দিল। 'অন্তরে আনন্দ আস্বাদ, বাহিরে বিহ্বল!' এমন সময়ে স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন ও কৃষ্ণনাম শুনাইয়া তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন।

প্রভু কহে 'কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু।
আপনার দুর্দৈবে পুনঃ হারাইনু॥
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় একস্থানে।
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে॥

তাঁহার মন বুঝিয়া স্বরূপদামোদর সুধাকণ্ঠে গীতগোবিন্দের সময়োচিত পদ গাহিলেন:

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্।

মহাপ্রভু প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সেই পদ পুনঃপুনঃ করায় গায়ন।
পুনঃপুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্তন॥
এই মত নৃত্য যদি হৈল বহুক্ষণ।
স্বরূপ গোসাঞি পদ কৈল সমাপন॥ [চ ৩।১৫]

সপ্তম অধ্যায়

সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞান

ত্যাগের পরাকাষ্ঠা

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুইজনেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট আনুষ্ঠানিক-ভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস ঈশ্বরার্থে সমুদয় এষণা বা বাসনার সম্যক্ ত্যাগ। স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ও ব্যাকুলতা সহায়ে পূর্বেই তাঁহারা জগৎকারণকে নানাভাবে দর্শন ও সম্ভোগ করিয়াছিলেন; সুতরাং জাগতিক সুখস্পৃহা আপনা হইতেই তাঁহাদের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। ইহাকে 'আন্তর সন্ন্যাস' বলা যাইতে পারে। সাধকমাত্রেরই পক্ষে এই আন্তর সন্ন্যাস অপরিহার্য। বাহ্য বা আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস কাহারও কাহারও পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। উহা কেবল ব্যক্তিগতভাবে সাধকের নিজের জন্যই নহে, ব্যক্তির সমষ্টি সমাজে আদর্শ স্থাপনের জন্যও অত্যাবশ্যক। কারণ, বাহ্য ত্যাগ না দেখিলে সাধারণ মানুষ ত্যাগের মর্ম বুঝিতে পারে না। জগদ্‌গুরু দুই মহাপুরুষ পৃথক্ দুই ভোগ-পঙ্কিল যুগে কামকাঞ্চনত্যাগের যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন. ইতিহাসে তাহার তুলনা মিলে না। একটি করিয়া দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহাদের ত্যাগের মহিমা সুপরিস্ফুট হইবে।

শাস্ত্রকারেরা জিহ্বা ও উপস্থ ইন্দ্রিয়-দুইটিকে জাগতিক ভোগের প্রধান দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। উহাদের একটি জিত না হইলে অপরটিও সংযত হয় না। জিহ্বা-জয় সুতরাং জিতেন্দ্রিয়তার পরিচায়ক। অসাধারণ-রূপযৌবন-সম্পন্ন শ্রীগৌরাঙ্গের সংসার-বৈরাগ্যে সন্দিহান হইয়া বাসুদেব সার্বভৌম পরীক্ষার্থে তাঁহার জিহ্বায় চিনি ঢালিয়া দিলেন; কিন্তু সেই

চিনি হাওয়াতে ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িয়া গেল—ভিজিল না! রসনা রসক্ষরণে সমর্থ হইল না![১]

কলিকাতার মত রাজধানীর শ্রেষ্ঠ হাবভাবসম্পন্ন বারনারীগণের দ্বারা রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিতে গেলেন। তিনি 'মা মা' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন ও তাঁহার ইন্দ্রিয় কর্মাঙ্গের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইল। দিগ্বিজয়িনী রমণীরা তাঁহার জননী-বুদ্ধির নিকট হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং অননুভূতপূর্ব বাৎসল্য-রসের সঞ্চারে তাঁহাদের গণ্ড বাহিয়া অনুতাপের অশ্রু ঝরিয়া পড়িল!

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞান

মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাব-সাধনার চরমভূমিতে উপনীত হইলেন। জগৎকারণের 'ভাবাতীত ভাব' বা নির্গুণ তুরীয় স্বরূপ উপলব্ধি করিবার বাসনা অতঃপর তাঁহার চিত্তে উদিত হইল। ভাবাতীত রাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শনস্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দ-রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁহার মন এখন ভূমানন্দের দিকে ধাবিত হইল।

দশনামী নাগা-সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী যদৃচ্ছাক্রমে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চল্লিশ বৎসরের কঠোর সাধনায় তোতা নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়াছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের দ্বারস্বরূপ। ঠাকুরকে দেখিয়াই তিনি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনার উত্তম অধিকারী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং ঐ সাধনায় তাঁহার ইচ্ছা আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। 'আমি কিছুই জানি না—সব আমার মা জানে'—বলিয়া ঠাকুর জগন্মাতার মতামত জানিবার জন্য কালীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া মার বাণী শুনিতে

১ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

পাইলেন, 'যাও শিক্ষা কর ; তোমাকে শেখাবার জন্যই এখানে সন্ন্যাসীর আগমন হয়েচে।'

সন্ন্যাসীর পক্ষেই অদ্বৈত-বেদান্ত বা ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা প্রশস্ত। বিধিপূর্বক সন্ন্যাসে পিতৃপুরুষ ও নিজাত্মার তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি করিয়া, 'বিরজা হোম' নামক যজ্ঞ করিতে হয়। গুরুর নির্দেশে ঠাকুর একে একে সমুদয় অনুষ্ঠান করিলেন। বৈধকর্মের প্রতীকস্বরূপ শিখাসূত্র চিরতরে অগ্নিতে আহুত হইল এবং ব্রহ্মজ্যোতির প্রতীকস্বরূপ গৈরিকবস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার উজ্জ্বল দেবতনু অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। অনন্তর গুরুমুখে আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ শ্রবণ করিয়া তিনি মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ গুরুকে বিস্ময়ে বিমূঢ় করিয়া, একদিনেই নির্বিকল্প সমাধিসাগরে ডুবিয়া গেলেন। তিনদিনের ভিতর সেই সমাধি হইতে আর ব্যুত্থিত হইলেন না।

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া তোতাপুরী—যিনি তিনদিনের বেশী একস্থানে থাকিতেন না—একাদিক্রমে এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ার পর ঠাকুর নিরন্তর ছয়মাস নির্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞান

ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ও ভক্তিপ্রেমকে পরস্পর বিরোধী মনে করিয়া থাকেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গ্রন্থসমূহে জ্ঞানপথের বহু নিন্দা এবং জ্ঞানীদের উপর কটুভাষায় আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসে তাঁহারা জীবোদ্ধারাদি প্রয়োজন-মাত্র দেখিয়া থাকেন, তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন না। সন্ন্যাস গ্রহণের বহু পূব হইতে তিরোভাব-কাল পর্যন্ত বহু জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁহার যে অন্তরঙ্গভাবে মিলন, ইহার কারণ প্রদর্শনে তাঁহারা বিস্ময়কররূপে নীরব।

তাঁহাদের নীরবতার অন্য কারণও থাকিতে পারে। 'শ্রীচৈতন্য ভক্তির অবতার।'[২] যুগপ্রয়োজনে ঐ লীলায় ভক্তিপ্রেমের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'চৈতন্যদেবের জ্ঞান ও ভক্তি দুইই ছিল; তাঁহার ভিতরে জ্ঞান ও বাহিরে ভক্তির প্রকাশ। হাতীর যেমন ভিতরের দাঁত ও বাহিরের দাঁত থাকে, সেইরকম।' তিনি আরও বলিতেন যে, খুব উচ্চ আধার না হইলে একাধারে জ্ঞান ও ভক্তি দুই হয় না। সেইজন্য অবতারাদিপুরুষে জ্ঞান ও ভক্তির যেরূপ সমন্বয় থাকে, অন্যত্র তাহা থাকে না।

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণাতেই যে মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ কেশবভারতীর নিকট সংস্কার বা আনুষ্ঠানিক কার্যাদি করাতেই বুঝিতে পারা যায়। কেশবভারতীর আশ্রমে তখন আরও বহু দশনামী সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। মুরারি-গুপ্ত ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রেরণার কথা একরূপ স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন :

> ততঃ কিয়দ্দিনে প্রাহ ভগবান্ কার্যমানুষঃ।
> স্বপ্নে দৃষ্টো ময়া কশ্চিদাগতো ব্রাহ্মণোত্তমঃ॥
> সন্ন্যাসমন্ত্রং মৎকর্ণে কথয়ামাস সুস্মিতঃ।
> তং শ্রুত্বা ব্যথিতো রাত্রৌ দিশা চাহং বিরোদিমি॥
> কথং প্রিয়ং হরিং নাথং ত্যক্ত্বান্যত্তুচিত্তং মম।
> মুরারিঃ প্রাহ তং শ্রুত্বা তন্মন্ত্রে ভগবান্ স্বয়ম্॥
> ষষ্ঠীসমাসং মনসা বিচিন্ত্য ত্বং সুখী ভব॥
> ততোবাচ প্রভুর্বাচং তথাপি খিদ্যতে মনঃ।
> শব্দশক্ত্যা করিষ্যামি কিমিত্যুক্ত্বা রুরোদ সঃ॥ [মু ২।১৭]

কড়চা-ধৃত মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা গেল, স্বপ্নে এক ব্রাহ্মণোত্তম

২ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।

আসিয়া হাসিমুখে মহাপ্রভুর কর্ণে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক সন্ন্যাসমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর এই অনুভূতির সঙ্গে ঠাকুরের এক অনুভূতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সাধনার প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দেখিতেন, তাঁহারই মত দেখিতে, এক যুবক সন্ন্যাসি-মূর্তি ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া তাঁহাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন। তাঁহারই কাছে শ্রুত তত্ত্বকথাসমূহ তিনি তোতাপুরী-প্রমুখ গুরুগণের মুখে পুনঃশ্রবণ করিয়াছিলেন মাত্র। ঠাকুর দেখিতেন সন্ন্যাসিমূর্তি, আর মহাপ্রভু দেখিয়াছিলেন ব্রাহ্মণমূর্তি—ইহাই তফাত। উহা হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহাদের উভয়েরই অন্যকে গুরুপদে বরণ কেবল শাস্ত্রবিধির মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত।

যাহা হউক, সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য-প্রমুখ ভক্তগণ সহ রওনা হইয়া কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রশেখর মহাপ্রভুর স্থলবর্তী হইয়া শ্রাদ্ধাদি বৈধকার্যসমূহ সম্পন্ন করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন :

বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি। [ভা ২।২৬]

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর মহাপ্রভু গুরুকর্তৃক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে আখ্যাত হন। ঠাকুরের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম কে দিয়াছিলেন, ঠিক জানা যায় না।[৩]

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন : '…শ্রীচৈতন্য একজন ভারতীর নিকট সন্ন্যাস লইয়াছিলেন ; সুতরাং ভারতী ছিলেন বটে, কিন্তু মাধবেন্দ্র-

৩ ঠাকুরের পিতৃবংশের তিন পুরুষের মধ্যে সকলের নামের সঙ্গেই 'রাম' শব্দ যুক্ত দেখা যায়। রামকৃষ্ণ নামটি বংশধারানুযায়ী রাখা তাঁহার মুখ্য নাম বলিয়াই মনে হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাতায় তাঁহার নাম লেখা ছিল রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীই প্রথম তাঁহার ধর্মপ্রতিভা জাগ্রত করিয়া দেন। বোধ হয় যেন পুরীসম্প্রদায় বঙ্গদেশের আধ্যাত্মিকতা জাগাইতে বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন।'[৪] ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, স্বামিজী শ্রীমৎ মাধবেন্দ্র-পুরীকে দশনামী সন্ন্যাসীর মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মাধবেন্দ্রের কোন সম্পর্কই যে নাই ইহা আমরা পরে প্রতিপাদন করিব।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের জ্ঞান-প্রচার

মহাপ্রভুতে জ্ঞানের ভাব যেমন ভিতরে গুপ্ত, তদীয় অন্যতর বাহু তদভিন্নস্বরূপ শ্রীমদদ্বৈতাচার্যে উহা তেমনি বাহিরে ব্যক্ত। অদ্বৈতাচার্যের পূর্বে অপর কোন বাঙ্গালী বঙ্গদেশে এমন জোরে বেদান্ত প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে নিত্যানন্দপ্রভু ও অদ্বৈতপ্রভু জীবতত্ত্ব নহেন। তাঁহারা ঈশ্বরের বিশিষ্ট অংশ বা ঈশ্বরকোটি। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কথার সমর্থন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কার্য ভগবান শ্রীচৈতন্যের কার্য হইতে অভিন্ন মনে করিতে হইবে। নিত্যানন্দে ভক্তি-সাধনার ও অদ্বৈতে জ্ঞান-সাধনার বিশেষ প্রকাশ।

ভক্তি-সাধনায়ও শ্রীঅদ্বৈত অতুলনীয় ছিলেন। তাঁহারই আকুল আহ্বানে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। একাধারে জ্ঞান-ভক্তির এই অপূর্ব মিলন শ্রীহরিদাস-প্রমুখ বিশিষ্ট অন্তরঙ্গগণ ব্যতীত অপর লোক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্যের দুর্জ্ঞেয় বচন॥ [ভা ২।১০]

৪ হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা' প্রবন্ধ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে তাই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে :

অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কার।
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি তাঁর ॥

অদ্বৈতাচার্যের পূর্বনাম শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য। তাঁহার 'অদ্বৈতাচার্য' আখ্যা কেন হইল, সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে : 'অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ।' পুনশ্চ,

'সর্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যো নাহি যাঁর সমান,
অতএব অদ্বৈত-আচার্য তাঁর নাম।' [চ ৩।৭]

আচার্যের নামে এইরূপ ব্যাখ্যা সম্প্রদায়ানুরোধে পরে আরোপিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবাব কারণ আছে। ঐ পুস্তকের অন্যত্র শ্রীনিত্যানন্দ বলিতেছেন :

... তুমি অদ্বৈত আচার্য।
অদ্বৈত-সিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য ॥
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে।
একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে ॥ [চ ২।১২]

রহস্যচ্ছলে বলা হইলেও একভাবে উহাই শ্রীঅদ্বৈতের স্বরূপ-পরিচয়; অর্থাৎ তিনি অদ্বৈত-বেদান্তের আচায।

আচার্যের শিক্ষার গুণে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিশ্বরূপ যখন সংসার ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং তাহার অনেকদিন পরে কনিষ্ঠ শ্রীবিশ্বম্ভরও 'লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর', তখন শ্রীমতী শচীদেবী মনের দুঃখে বলিয়াছিলেন :

কে বোলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাঞি।
চন্দ্র সম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥

অনাথিনী মোরে ত কাহারো নাহি দয়া।
জগতের অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া॥ [ভা ২।২২]

'জগতের অদ্বৈত, মোরে সে দ্বৈত-মায়া!'—একথা আচার্যের অদ্বৈত-জ্ঞান প্রচারের উপর কটাক্ষ করিয়াই যে বলা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। একমাত্র অদ্বৈত-বেদান্তই দ্বৈত-প্রপঞ্চকে মায়িক বলিয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বম্ভরের জন্মের পূর্ব হইতেই আচার্য বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার কাছে পড়িয়াই শ্রীবিশ্বরূপ 'বেদান্ত-সিদ্ধান্ত জ্ঞানে সর্বধর্মমর্ম।' [ম ২] ঐ বেদান্ত যে অদ্বৈত-বেদান্ত, তাহা তাঁহার দশনামী গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ হইতেই বুঝা যায়। কেননা সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার 'জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।' [ভা ১।৫]

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রকাশ-কালে আচার্য একবার ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া জ্ঞান প্রচার করিতেছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যভাগবতে এরূপ বর্ণনা আছে। ঐ উপেক্ষার কারণ:

বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব বৈষ্ণবেরে।
মহা ভক্তি করেন, বিশেষ অদ্বৈতেরে॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুরনাথ।
মনে মনে গর্জে, চিত্তে না পায় সোয়াথ॥
নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুতা ছাড়িয়া মোর চরণেতে ধরে॥
বলে নাহি পারোঁ মুঞি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥
... ...
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনি যেন মোরে শাস্তি করে॥

ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিমু—এই মন্ত্র সার॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি।
প্রভু মোরে শাস্তি করিবেক চুলে ধরি॥

এই সঙ্কল্প লইয়া আচার্য নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং যোগবাশিষ্ঠের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন:

জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ 'জ্ঞান' সর্বশক্তি॥
হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন॥
বিষ্ণুভক্তি দর্পণ, লোচন হয় জ্ঞান।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম?
আদিবৃদ্ধ আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব-অভিপ্রায় 'জ্ঞান' মাত্র॥

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গে শান্তিপুরে আসিয়া মহাপ্রভু আচার্যের 'জ্ঞানানন্দরঙ্গ' দেখিলেন। ঐশ্বরিক ভাবের আবেশে মহাপ্রভুর মূর্তি তখন 'কোটিসূর্যময়' হইয়াছে।

ক্রোধমুখে বোলে প্রভু—আরে আরে নাঢ়া!
বোল দেখি জ্ঞান-ভক্তি দুইতে কে বাঢ়া?
অদ্বৈত বোলয়ে—সর্বকাল বড় জ্ঞান।
যার জ্ঞান নাহি তার ভক্তিতে কি কাম?
'জ্ঞান বড়' অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাশরিলা শ্রীশচীনন্দন॥

মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে 'নাঢ়া' বলিতেন।

পিঁড়া হৈতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥

হাঁকে গর্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ-বচনে — ।
শুতিয়া আছিলুঁ ক্ষীর-সাগরের মাঝে।
আরে নাঢ়া ! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে ॥
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস জ্ঞান, ভক্তি লুকাইয়া ॥
যদি লুকাইবা ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন কাজে ?
তোহোর সঙ্কল্প মুঞি না করোঁ অন্যথা।
তুঞি মোরে বিড়ম্বনা করিস সর্বথা ॥ [ভা ১।১৯]

উপরিধৃত বর্ণনা হইতে আমরা মোটামুটি এই বুঝিলাম : (১) জ্ঞান হইতে ভক্তির মাহাত্ম্য বেশী, (২) সেই মাহাত্ম্য লোকে প্রচার করিতেই আচার্য ভগবানকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন ; কিন্তু, (৩) আচার্যেরই সাম্প্রতিক কার্য তাহাতে বিঘ্ন জন্মাইতেছে—তিনি ভক্তিকে খাট করিয়া জ্ঞান ব্যাখ্যা করিতেছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মহাপ্রভু জ্ঞানকে খণ্ডন করেন নাই বা তত্ত্বতঃ জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন কথাও বলেন নাই। আচার্য বিরুদ্ধাচরণ করিলে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না—যুগধর্ম প্রচারিত হইবে না, ইহাতে আচার্যের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমত্তাই সূচিত হইতেছে।

যাহা হউক; পূর্বোক্ত ঘটনার পরে আচার্য জ্ঞান-প্রচার একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এমন কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতও বলেন না। বহু পরের লেখা পুস্তক 'প্রেমবিলাসে'র বর্ণনা হইতে জানা যায়, পরবর্তী কালে তিনি

পঞ্চবিধা মুক্তি ব্যাখ্যা করিতেন অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রচার করিতেন। বস্তুতঃ তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়াই জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য 'শঙ্কর' কামরূপে ফিরিয়া 'মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্ম' প্রবর্তন করেন। ঐ ধর্ম জ্ঞানভক্তি-মূলক।

'প্রেমবিলাস' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' বর্ণিত আছে যে, শঙ্করকে আচার্য জ্ঞাননিষ্ঠা ছাড়িতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় আচার্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। আমরা একথায় কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারি না, কেননা, তাহা হইলে আচার্যকে অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত ও সর্বতোভাবে আচার্যপদের অযোগ্য বলিতে হয়। তাঁহার মহান্ চরিত্রে ঐরূপ কলঙ্ক আরোপের চেষ্টা কাহারও পক্ষেই গৌরবের কথা নহে। ঐ দুই পুস্তকের তজ্জাতীয় বর্ণনায় বিশ্বাস করিবার পূর্বে আমাদিগকে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহাদের রচনাকালের পূর্বেই বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ-প্রচারিত সাম্প্রদায়িক মতবাদ বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে এবং উহার প্রতিষ্ঠাতাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেই বিশেষভাবে বইগুলি রচিত হইয়াছে। ঘটনা সত্যই ঐরূপ হইলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উহা লিপিবদ্ধ হয় নাই কেন?

প্রেমবিলাসের মতে—

কামদেবনাগর আর আগলপাগল।
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ আর যে শঙ্কর॥ [২৪শ বিলাস]

কেবল এই শিষ্যত্রয়ই নহেন, পরন্তু আচার্যের আরও অনেক শিষ্য প্রশিষ্য, এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ যে গোস্বামি-মতবাদ হইতে স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করিতেন তাহার স্পষ্ট উল্লেখ বৈষ্ণব সাহিত্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

স্বয়ং শুদ্ধাভক্তির শ্রেষ্ঠ অধিকারী হইয়াও আচার্য জ্ঞানপ্রচার করিতেন। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দই তাঁহার সঙ্গে তুলিত হইতে পারেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'নরেন্দ্রের বাহিরে জ্ঞান, ভিতরে ভক্তি!' আবার নিজের সম্বন্ধে বলিতেন, 'আমার ভিতরে জ্ঞান, বাহিরে ভক্তি।' মহাপ্রভুর ভক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিটি এস্থলে স্মরণীয়।

আচার্যের জ্ঞান-ভক্তি-সাধনার ধারাটি তদীয় বংশধরগণের ভিতর দিয়া একরূপ অব্যাহতগতিতে চলিয়া আসিয়াছে বলা যাইতে পারে। কারণ, মাঝে মাঝে ঐ বংশে অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন জ্ঞান-ভক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শান্তিপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, ষড়্‌দর্শনে বিজ্ঞ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি ও মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নাম করা যাইতে পারে। রাধামোহন ঐ বংশের 'গোস্বামী ভট্টাচার্য' শাখায় জাত এবং অদ্বৈতপ্রভু হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে কাশী-কাঞ্চি-মিথিলাদি স্থান হইতে ছাত্রেরা পড়িতে আসিত।[৬] বিজয়কৃষ্ণ ঐ বংশের 'আতাবুনিয়া' শাখায় জাত প্রখ্যাত মহাপুরুষ।

মাধবেন্দ্রপুরী দশনামী সন্ন্যাসী

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যে অদ্বৈতপ্রভুকে মহাবিষ্ণুর ও সদাশিবের অবতার বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ শিব জ্ঞানের প্রতীক। আচার্যের মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ই ঐরূপ কল্পনার কারণ, মনে হয়। আচার্য এই জ্ঞান-ভক্তি-যোগ তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন। কারণ, মাধবেন্দ্রপুরী দশনামী জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইয়াও অহৈতুকী ভক্তির আদর্শ ছিলেন। সম্ভবতঃ

---

৬ শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এম্-এ, বি-এল লিখিত 'শান্তিপুর-পরিচয়—দ্বিতীয় ভাগ'।

আচার্য ও মাধবেন্দ্রপুরীর চরিত্রে ভাবগত-সাদৃশ্য দেখিয়াই মুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন :

আদৌ জাতো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রীমাধবপুরী প্রভুঃ।
ঈশ্বরাংশো দ্বিধা ভূত্বাঽদ্বৈতাচার্যশ্চ সদ্‌গুণঃ॥ [মু ১।৪]

ঈশ্বরাংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীমাধবপুরী প্রভু ও পরে সদ্‌গুণান্বিত অদ্বৈতাচার্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বৃন্দাবনদাসও লিখিয়াছেন :

মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যদ্যপি ভেদ নাঞি।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্যগোসাঞি॥ [ভা ৩।৪]

(১) জ্ঞানোত্তর প্রেমের উদাহরণ

ব্রহ্মজ্ঞানই পরাভক্তি লাভের চরম সোপান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, গোপীদেরও ব্রহ্মজ্ঞান ছিল। [ক ৪।১৬।১] যাঁহারা নির্বিকল্পসমাধিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পর পরাভক্তি লাভ করিয়াছেন, শ্রীমৎ শুকদেব ও চতুঃসন অর্থাৎ সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার তাঁহাদের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল পৌরাণিক দৃষ্টান্ত। তাহাদের জ্ঞান ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়াই জ্ঞানী ও ভক্ত উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ে টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং নিজের নিজের ভাবে অর্থাৎ জ্ঞান কিংবা ভক্তিকে প্রধানরূপে দেখাইয়া তাঁহাদের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন।

যাঁহারা পৌরাণিক দৃষ্টান্তে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। পুরীর গোবর্ধনমঠাধীশ ও তৎকালীন ভারতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী, যিনি নাগা-সন্ন্যাসীর সৃষ্টি করিয়া মুসলমান ফকীরদের অত্যাচার হইতে হিন্দু সাধুর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাঁহার লিখিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র এক একটি বাক্য বুঝিতে অতি বড় পণ্ডিতেরও মাথা

ঘুরিয়া যায় এবং তজ্জন্য সমগ্র ভারতে ঐ পুস্তকের নিঃশেষে-অধ্যয়নকারী পণ্ডিত খুঁজিয়া পাওয়া ভার, বাংলার গৌরব সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও মনীষার অধিকারী মহাপুরুষ শেষজীবনে কাশীধামে থাকিয়া কেবল 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ!' বলিয়া রোদন করিতেন। কাশীর বিজ্ঞ সন্ন্যাসীরা একযোগে তাঁহাকে অজ্ঞ ভাবুকের ক্রন্দন হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলে তিনি নিম্নোক্ত শ্লোকে উত্তর করিয়াছিলেন :

অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥[৭]

'স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ' কথাটিতে তিনি যে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া স্বানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। অথচ এখন তিনি নিরুপায়, কেননা, এক ধূর্ত গোপবধূলম্পট, কেমন করিয়া বলিতে পারেন না, হঠাৎ তাঁহাকে দাসী করিয়া ফেলিয়াছে। এখন তিনি আর নিজেতে নাই। সেইহেতু অদ্বৈতপথের পথিক সন্ন্যাসীদের উপাস্যস্থানীয় 'জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য' হইয়াও, আজ তিনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে নিদারুণভাবে অসমর্থ।

এইরূপ সর্ববন্ধবিনির্মুক্ত আত্মারাম পুরুষেরাও যে পরম পুরুষে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহাই জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীহরির লোকোত্তর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।[৮]

---

৭ পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধিঃ' গ্রন্থের ভূমিকায় শ্লোকটির প্রথমার্ধের এইরূপ পাঠ দিয়াছেন : 'অদ্বৈত-সাম্রাজ্য-পথাধিরূঢ়া স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।' উহা পূর্ব হইতে প্রচলিত পাঠ বা প্রবাদের অনুরূপ নহে। শ্লোকটি মূলতঃ শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত। শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী তদীয় 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' পুস্তকের পশ্চিম বিভাগ—প্রথমা লহরীতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

৮ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।

(২) মাধ্ব ও গৌড়ীয় মতের অনৈক্য

শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, তাহা লইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে বাদানুবাদের অন্ত নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে পুরীজীকে প্রেমধর্মের অঙ্কুর বলা হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এবং মহাপ্রভুর বিশিষ্ট পার্ষদ শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি তাঁহার মন্ত্রশিষ্য। স্বয়ং মহাপ্রভু তদীয় শিষ্য শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর মন্ত্রশিষ্য। সপার্ষদ মহাপ্রভু সেই প্রেমধর্মের ফলফুলশোভিত মহাবৃক্ষ। মহাপ্রভু হইতেই যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রবর্তনা স্বীকার করিতেন, তাহাই সুষ্ঠু ও শোভন হইত এবং ইদানীন্তন এই বাদানুবাদেরও অবসর মিলিত না।

যাঁহারা শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তি স্বীকার করেন না, তাঁহাদের যুক্তি এতই প্রবল এবং ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা সমর্থিত যে, অধুনাতন বিজ্ঞ বৈষ্ণবেরাও তাহা না মানিয়া পারিতেছেন না। শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন 'ভগবৎসন্দর্ভে'র ভূমিকায় লিখিয়াছেন ঃ

"শ্রীমন মহাপ্রভু সম্প্রদায়-অনুরোধে মাধ্ব-সম্প্রদায়কে গুরুসম্প্রদায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উক্তি ভিন্ন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতির মধ্বাচার্য-সম্প্রদায়-ভুক্তির অপর কোন প্রমাণ দেখিতে পাই না।...যদি গুরুপ্রণালিকাই ধরিতে হয়, তাহা হইলে তিনি শেষবার শঙ্করসম্প্রদায়ী শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, এই সম্প্রদায়কে সেই শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা না যাইবে কেন?...

"শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে অন্য কোন আচার্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে সম্প্রদায়ের গৌরবহানিই হয়, এবং সেই সম্প্রদায়ের ন্যূনতাকেও স্বীকার করিয়া লইতে হয়।...শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের টীকায় পরমকৃপাপাত্র আনন্দী মহাশয় লিখিয়াছেন—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুঃ স্বয়ং ভগবানেব সম্প্রদায়প্রবর্তক স্তৎপার্ষদা এব সাম্প্রদায়িকা গুরবো নান্যে।'...

"শ্রীমন মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ মধ্যে যাঁহারা শ্রীপাদ ছয় গোস্বামী মহাশয়গণ তৎকর্তৃক শিক্ষিত হইয়া যেসকল গ্রন্থাদি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা পাঠে তিনি মাধ্বমতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কোন কথাই পাওয়া যায় না। শ্রীজীবের দার্শনিক গ্রন্থসমূহে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্তই অধিক পরিমাণে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী বলা যাইতে পারে না।"

শ্রীপ্রাণনাথ [illegible] লিখিয়াছেন: "গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় [illegible] সর্বস্বীকৃত যে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব [illegible] মধ্বাচার্য বা রামানুজাচার্যের বেদান্তভাষ্যে [illegible] উক্ত, তাহা [illegible] হইয়াছে। [illegible] বলিয়াই গৌড়ীয় [illegible] সম্প্রদায় [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] অর্থাৎ মধ্বীয় শাখাবিশেষ [illegible] বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পরিত্যক্ত [illegible] নহে।"

শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা [illegible] ২৮শ সূত্রের তাৎপর্যে লিখিয়াছেন: "[illegible] শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, লক্ষ্মী তাঁহার প্রধান শক্তি, [illegible] তাঁহার অনন্তকোটি লীলাপরিকর লীলাদেহে স্বয়ংভগবান [illegible] নহে, আনন্দই প্রাধান্য, ভক্তি প্রধান পুরুষার্থ, ব্রহ্মানন্দ [illegible] মুক্তি, কেবল — ভক্তগণের মধ্যে প্রধান, ব্রহ্মাবধি সাযুজ্যমুক্তি অভীষ্ট নহে।" এইসকল মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে স্বীকৃত নহে।

শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন: "দার্শনিকতা ও সাধনা এই দুই দিক দিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সহিত নিম্বার্কমতের বহু সাদৃশ্য আছে। যদিও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের শাখা বলিয়া আপনাদিগকে স্বীকার করিয়া থাকেন তথাপি জগৎকারণতা সম্বন্ধে

১ বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম।

উভয় সম্প্রদায়ের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্যে' মাধ্বসম্প্রদায়-স্বীকৃত 'ব্রহ্মের নিমিত্তকারণতামাত্র' খণ্ডিত করিয়াছেন।"[১০]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে যে, স্বয়ং মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ-কালে তত্ত্ববাদীদের অর্থাৎ মাধ্বমতাবলম্বীদের মঠে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার উত্তরে তত্ত্ববাদী আচার্য বলেন :

… বর্ণাশ্রমধর্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥

তাহাতে মহাপ্রভু উত্তর করিয়াছিলেন :

… শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবাফলের পরম সাধন ॥
শ্রবণ কীর্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পরম পুরুষার্থ— পুরুষার্থসীমা ॥
কর্মত্যাগ কর্মনিন্দা সর্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম হৈতে কৃষ্ণপ্রেমভক্তি কভু নহে ॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥

… … …

… কর্মী, জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন।
তোমার সম্প্রদায় দেখি সেই দুই চিহ্ন ॥ [চ: ২।৯]

শেষোক্ত পয়ারে 'তোমার সম্প্রদায়' কথাটি অর্থপূর্ণ।

---

১০ 'বেদান্ত-সম্প্রদায়সমূহে জগৎকারণবাদ' : উদ্বোধন— আষাঢ়, ১৩৪৮।

উপরিধৃত পণ্ডিতগণের—ইঁহাদের প্রায় সকলেই নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব—, তথা গোস্বামি-সিদ্ধান্ত-মঞ্জুষা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের লেখকের অভিমত হইতে আমরা সুনিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলাম যে, মতবাদের দিক দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাধ্বমতের আনুগত্য করেন না। অথবা যেটুকু করেন, সেইটুকু এতই অল্প এবং অন্যান্য-বৈষ্ণব-মত-সাধারণ যে, তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, বা উহার শাখা বলিতে পারা যায় না।

(৩) মাধ্ব গুরুপ্রণালী ও মাধবেন্দ্র

'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থে ডক্টর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার মাধবেন্দ্রপুরীর মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :

"...শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র ও তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট সমসাময়িক দুই ভক্ত—কবিকর্ণপূর ও গোপালগুরু—মাধবেন্দ্রপুরীকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অমরনাথ রায়, ডাঃ সুশীলকুমার দে ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রামাণিক গুরুপ্রণালীর সহিত ও ঐতিহাসিকভাবে নির্ণীত কালের সহিত কবিকর্ণপূরাদিবর্ণিত গুরুপ্রণালীর মিল নাই।"

ডক্টর মজুমদার অতঃপর শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রকাশিত উদীপিমঠের গুরুপ্রণালী ও কবিকর্ণপূরের লেখা বলিয়া প্রচারিত গুরুপ্রণালী পাশাপাশি রাখিয়া, যেখানে যেখানে অমিল পরিস্ফুট সেখানে সেখানেই জোড়াতালি দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বিস্তৃত আলোচনার শেষাংশে তিনি যাহা বলিয়াছেন প্রয়োজনবোধে কেবল তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া উত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছি।

"মঠের তালিকায় লক্ষ্মীপতি, মাধবেন্দ্র ও ঈশ্বরপুরীর নাম নাই। তাহার দুইটি কারণ হইতে পারে। প্রথম কারণ হয়ত লক্ষ্মীপতি

মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু মঠাধীশ হন নাই—মঠে শুধু মঠাধীশদেরই নাম আছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে কবিকর্ণপূর মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপ্রণালী দিলেও, মাধবেন্দ্রকে প্রেমধর্মের প্রবর্তক বলিয়াছেন। মাধবেন্দ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহীদের লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার নাম ও তাঁহার গুরু লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্বগুরুপ্রণালী হইতে পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব। প্রবোধানন্দ তাঁহার প্রশিষ্য হিতহরিবংশকে আশ্রয় দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম যেমন চৈতন্যচরিতামৃতে দেওয়া হয় নাই [?] তেমনি মাধবেন্দ্রের গুরু বলিয়া লক্ষ্মীপতির নাম মাধ্বসম্প্রদায় হইতে কাটিয়া দেওয়া বিচিত্র নহে।…

"…পুরী উপাধিযুক্ত মাধবেন্দ্র কি করিয়া তীর্থ উপাধিধারী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের শিষ্য হইলেন তাহাও বুঝা কঠিন। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে সকল পুরী-ভারতীই শঙ্কর-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। অনেক গৃহী ব্যক্তির উপাধিও পুরী, ভারতী প্রভৃতি ছিল। যথা, অসমীয়া শঙ্করদেবের বংশপরিচয়ে দেখা যায় গন্ধর্বগিরির পুত্র রামগিরি, রামগিরির পুত্র হেমগিরি, তাঁহার পুত্র হরিহরগিরি প্রভৃতি…। শান্তিপুরের অদ্বৈত-বংশীয় গোস্বামীরা অদ্বৈতের পূর্বপুরুষদের যে পরিচয় দেন, তাহাতে পাওয়া যায় জটাধর ভারতীর পুত্র বাণীকান্ত সরস্বতী, তৎপুত্র সাকুতিনাথ পুরী…। প্রাণতোষণী তন্ত্রে আছে—

জ্ঞাততত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতিঃ।
পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচ্যতে ॥[১১]

এই হিসাবে যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পারে।

"…হয়ত প্রথমে তিনি পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হন, তারপর

১১ মুদ্রিত পুস্তকে (বসুমতী সংস্করণ) অন্যরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়, যথা: জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ। পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে ॥—গ্রন্থকার।

অদ্বৈতবাদে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দ্বৈতবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রেমধর্মের যথেষ্ট স্ফুরণ না দেখিয়া নিজে এক সম্প্রদায় গঠন করেন।"

উদ্ধৃত অভিমতসমূহ যে অনুমানমাত্র তাহা বর্ণনা হইতেই পরিস্ফুট। বাস্তব তথ্য দ্বারা কিয়দংশে সমর্থিত না হইলে অনুমানের কোনই মূল্য থাকে না।

প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, মাধবেন্দ্র কি অত্যন্ত অস্থির প্রকৃতির লোক ছিলেন? তিনি জীবনে একাধিকবার সম্প্রদায় পরিবর্তন করিতে পারেন, তিনি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিলে যে পুনরায় অন্য কিছু করিতেন না, তাহারই বা প্রমাণ কী? কেবল অনুমানের উপর শ্রীচৈতন্যের মহান পরমগুরুর উপরে এতখানি চপলতা আরোপ করিতে ভক্তমাত্রেই কুণ্ঠিত হইবেন। তিনি নূতন কোন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন এমন কথা বৈষ্ণব গ্রন্থে তো কোথাও নাই। যাঁহারা তাঁহাকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার ঐ সম্প্রদায়ত্যাগের কথা বলেন না। তিনি যদি মাধ্বসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন সম্প্রদায় গঠন করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা সেই নূতন সম্প্রদায়ের নামে নিজেদের পরিচয় না দিয়া, পরিত্যক্ত সম্প্রদায়ের নামে দিতে গেলেন কেন? আর যদি পরিত্যক্ত সম্প্রদায়ের নামে পরিচয় দিতেই হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথমে যেটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল সেই শাঙ্কর-সম্প্রদায়ের নামে দেওয়াই তো অধিক যুক্তিসঙ্গত হইত। তিনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সেই সম্বন্ধে যাঁহারা নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সম্প্রদায়পরিত্যাগী বা নূতন সম্প্রদায়ের স্রষ্টা বলেন নাই। তাঁহাদের লেখা হইতে তিনি এক মহাপ্রেমিক সন্ন্যাসী ছিলেন, এইমাত্র জানিতে পারা যায়।

"মাধবেন্দ্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও গৃহীদের লইয়া এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি" করিয়া থাকিলে সেইসকল গৃহী ও সন্ন্যাসীদের ভজন-

পদ্ধতি একরূপই হইত। পরমানন্দপুরী, রামচন্দ্রপুরী প্রমুখ যাঁহারা মাধবেন্দ্রের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়া পরিচিত, এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে দীর্ঘকাল বসবাস করিয়াছেন, তাঁহারা কোনও কালে, একদিনের জন্যও, মহাপ্রভু কিংবা তদীয় সাঙ্গোপাঙ্গদের সহিত নর্তন-কীর্তনে যোগ দিয়াছেন এমন বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। বরং তাঁহারা যে শাঙ্করসম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী তাহার পরিচয়, হয়তো লেখকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, দুইএক স্থানে থাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা :

মাধবেন্দ্রপুরী যবে করে অন্তর্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরী গোসাঞি করে কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন।
'মথুরা না পাইলুঁ' বলি করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥
তুমি পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ—করহ স্মরণ।
চিদ্‌ব্রহ্ম হঞা কেনে করহ ক্রন্দন?
শুনি মাধবেন্দ্র মনে ক্রোধ উপজিল।
দূর দূর পাপিষ্ঠ বলি ভর্ৎসন করিল॥

... ...

কৃষ্ণ না পাইলুঁ মুঞি মরো আপন দুঃখে।
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে॥ [চ ৩।৮]

এই বর্ণনা হইতে মনে হয় যে, স্বীয় গুরুর জ্ঞানোত্তর প্রেম রামচন্দ্রপুরী বুঝিতেন না। বুঝিতেন না বলিয়াই, অন্তিমকালে তাঁহাকে আত্মস্বরূপ চিন্তার পরিবর্তে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং যাঁহার শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হইয়াছেন সেই স্নেহময় গুরুর প্রতি অন্তিম

কর্তব্য পালন করিতে গিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী যতই দুর্মুখ হউন, এই কার্যে তাঁহার বালকবৎ সরলতারই পরিচয় পাওয়া যায়, আর তিনি যে শাঙ্করসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, সেই বিষয়েও অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে মাধবেন্দ্রপুরীর আরাধনা-তিথি উপলক্ষে তাঁহার গুণকীর্তন চলিয়াছে :

লোক দেখি দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী।
হেন নাহি তিলার্ধ সম্ভাষা যারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে না করেন সম্ভাষণ।
সেহো আপনারে মাত্র বোলে নারায়ণ॥
এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা॥ [ভা ৩।৪]

ভগবদ্‌ভক্তেরা সাধারণতঃ নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সঙ্গেই সাধুগোষ্ঠী বা হৃদ্‌গতভাব-বিনিময় করিয়া থাকেন। মাধবেন্দ্র জ্ঞানী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী না হইলে ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদিগকে সম্ভাষণের প্রশ্ন আদপেই উঠিতে পারে না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোকের মধ্যে কেহ মনের মানুষ খুঁজিতে যায় না, যদি বা কদাচ যায়, না পাইলে দুঃখিত হয় না। মাধবেন্দ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী হইলে তাঁহার এতটা দুঃখের কারণ থাকিত না, অন্ততঃ তদন্তর্গত সন্ন্যাসীদের সঙ্গে—যেহেতু তাঁহারা নিজেদের নারায়ণ বলেন না সেইহেতু—অনায়াসে কথা কহিতে পারিতেন

এই সহজবোধ্য বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী ব্রহ্মজ্ঞানী সন্ন্যাসী হইয়াও 'অকৈতব' প্রেমের অধিকারী কেমন করিয়া হইতে পারেন, তাহা দৃষ্টান্ত সহ প্রথমেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

ডক্টর মজুমদার পুরী, ভারতী ইত্যাদি সংজ্ঞা লইয়া ষোড়শ শতাব্দীর যে কথা তুলিয়াছেন সেই বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। তীর্থ,

ভারতী ও সরস্বতী শব্দ-তিনটি বর্তমানকালেও জ্ঞানী লোকের উপাধি-রূপে ব্যবহৃত হয়, না হয় সেই যুগে পুরী, গিরি ইত্যাদি আরও কয়েকটি অতিরিক্ত ছিল। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধিরূপেই মাধবেন্দ্র পুরী-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমন কথা কোথায় আছে? সন্ন্যাসীকে জাগতিক-ভাবে উপাধিভূষিত করার রীতি সাধারণতঃ দেখা যায় না। পূর্ব হইতে প্রাপ্ত উপাধিকে ব্যাধি-জ্ঞানে বর্জন করাই তাঁহার আশ্রমোচিত ধর্ম। আর মাধবেন্দ্র ঐভাবে উপাধি লাভ করিয়া থাকিলে, তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যেরাও সকলেই পুরী হইলেন কিরূপে? কেশবভারতী ও ব্রহ্মানন্দ-ভারতীকে যদি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-গ্রন্থে কোথাও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য-মধ্যে গণ্য করা হইয়া থাকে, তাহা সম্প্রদায়ানুরোধেই পরে করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। একই ভাবের ভাবুক হইলেই শিষ্য হয় না। দশনামী সাধুমাত্রেই স্বীয় সন্ন্যাসগুরুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; ইহার ব্যতি-ক্রমের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই। তবে ইদানীং কোন পুরাতন-আখ্যাধারী নব্য-সম্প্রদায় যে সেই নজীর সৃষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং যাদৃচ্ছিকভাবে ঐসকল উপাধি ব্যবহার করিতেছেন, তাহা আমাদের চক্ষের সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি।

মাধ্বসম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেবলমাত্র 'তীর্থ' উপাধির ব্যবহার ছিল। কারণ, স্বয়ং মধ্বাচার্য পূর্বজীবনে দশনামী সন্ন্যাসীর শিষ্য ও 'আনন্দতীর্থ' নামে পরিচিত ছিলেন। মাধবেন্দ্রও তাঁহার দশনামী গুরু হইতে প্রাপ্ত 'পুরী' অব্যাহত রাখিয়া মাধ্বশিষ্য হইতে পারিতেন, অন্ততঃ মাধ্ব গুরুর উদারতায় নির্ভর করিয়া ঐরূপ অনুমান করাও চলিত, যদি তাহার অনুকূলে কিছুমাত্র প্রমাণ পাওয়া যাইত।

প্রাণতোষণীর বচন-প্রমাণে "যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির উপাধি পুরী হইতে পারে", একথা বলা সঙ্গত নহে। কারণ, প্রাণতোষণীতে সন্ন্যাসা-শ্রম-প্রসঙ্গে 'আশ্রমবিশেষে সংজ্ঞাবিশেষলক্ষণং' শীর্ষক অনুচ্ছেদে ঐ শ্লোকটি আছে। আশ্রমবিশেষ বলিতে এখানে সন্ন্যাসাশ্রম বুঝাইতেছে।

ডক্টর মজুমদার মূলগ্রন্থ হইতে শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

পুরী, গিরি ইত্যাদি শব্দ বংশগত বা জাতিগত উপাধিরূপে ব্যবহৃত থাকা অসম্ভব নহে। পাঞ্জাবে পুরী-উপাধিধারী ক্ষত্রিয়জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে গিরি-উপাধিধারী গিরি ও গোয়ালা শ্রেণীভুক্ত বৈশ্যজাতীয় লোক আছে। কিন্তু সন্ন্যাসী মাধবেন্দ্রের সঙ্গে বংশগত উপাধির কী সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

গৃহস্থের গিরি, পুরী ইত্যাদি উপাধি-ব্যবহারের মধ্যে আর এক রহস্যও নিহিত থাকিতে পারে যাহা অনেকেই সম্ভবতঃ জানেন না। কোন দশনামী সন্ন্যাসী ধর্মচ্যুত হইয়া সংসারী হইলে গার্হস্থ্যজীবনে সন্ন্যাসাশ্রমের নাম ও উপাধি ত্যাগ করে না এবং তাঁহার পুত্রেরাও পিতার গিরি, পুরী ইত্যাদি উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকে। গৌরবের অথবা লজ্জার যাহাই হউক না কেন, উত্তর ভারতের কাশী প্রভৃতি স্থানে একটু অনুসন্ধান করিলেই উহার বহু দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষীভূত হইবে। ইহাও একটি প্রাচীন প্রথা, তবে ষোড়শ শতাব্দীতে উহা প্রচলিত ছিল কিনা আমরা বলিতে অক্ষম। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যখন তদপেক্ষা বহু প্রাচীন, তখন প্রচলিত থাকাই সম্ভব।

(২) মাধ্বগৌড়ীয়-সম্বন্ধগ্রন্থি-ভেদ

মতবাদ বা গুরুপরম্পরা কোন দিক দিয়াই যখন শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরী ও তদীয় শিষ্যগণের মাধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিজেকে পরিচিত করিতে গেলেন কেন, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠিয়াছে ও উঠিবে। আমাদের কাছে নিম্নোক্ত কারণগুলি প্রতিভাত হইয়াছে :

১। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥

পদ্মপুরাণের বলিয়া কথিত, অথচ মুদ্রিত পদ্মপুরাণে অপ্রাপ্ত, এই শ্লোক বা শ্লোকের মর্ম বহুপ্রচারিত হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মর্যাদা বহুগুণে বর্ধিত করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা উহার প্রভাব অতিক্রম করিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে সাহসী হন নাই।

২। নবজীবনের গতিশীলতার বেগ যখন কতকটা মন্দীভূত হইল, সেই স্থিতিশীলতার ও দার্শনিকতার যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, যে কারণেই হউক, সর্বভারতীয় যোগস্থাপনার প্রয়োজন অনুভব করিলেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চারি সম্প্রদায়ের একটিতে যোগ না দিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

৩। অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা মাধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের বাহ্যতঃ সাদৃশ্য অধিক। উভয় সম্প্রদায়েরই আদি প্রবর্তক দশনামী সন্ন্যাসীর শিষ্য।

৪। মাধ্ব (ব্রহ্ম) সম্প্রদায়ের অনুগামী লোক উত্তর-ভারতে বিরল। অপর তিন সম্প্রদায়ের অনুগামী লোকের সংখ্যা উত্তর-ভারতে খুব বেশী। বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রধানতীর্থ মথুরামণ্ডল নিম্বার্ক (সনকাদি) ও বল্লভাচারী (রুদ্র) সম্প্রদায়েরও প্রধানতীর্থ। শেষোক্ত তিন সম্প্রদায়ের কোন একটির শাখা বলিয়া নিজেদের সম্প্রদায়কে পরিচিত করিলে, অথচ স্ফুটভাবেই উহার সঙ্গে মতদ্বৈত পোষণ ও প্রচার করিলে নিত্য-বিবাদের পথ উন্মুক্ত হইত। সেইজন্য মধ্বসম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ-স্থাপনই নিরাপদ বিবেচিত হইয়াছে।

শ্রীমন্ মধ্বাচার্যের কৃতিত্ব বলিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন: "সমগ্র ভারতে শক্তিসঞ্চারকারী আর্যাবর্তের সেই একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুবর্তিগণও মহাত্মা মধ্বের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন!"[১২]

১২ হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা।

অষ্টম অধ্যায়

গুরুকে ভক্তিদান : জ্ঞান ও ভক্তি

পূর্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই গুরুকরণ বা অন্যকে গুরুপদে বরণ, কেবল শাস্ত্রবিধির মর্যাদা রক্ষার নিমিত্ত। তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া গুরুগণ বা শিক্ষাগুরুগণই নিজ নিজ জীবনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ জ্ঞানপথে সিদ্ধ সন্ন্যাসগুরুর ভক্তিপ্রাপ্তির কথা বলা যাইতে পারে।

শ্রীমৎ তোতাপুরীকে ভক্তিদান

জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ তোতাপুরী বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন না। ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়াকে তিনি ভ্রমমাত্র বলিয়া জানিতেন এবং উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব-স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার আবশ্যকতা মানিতেন না। তাঁহার মতে অজ্ঞান হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধকের কেবলমাত্র পুরুষকারই অবলম্বনীয়, তজ্জন্য ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের করুণা ভিক্ষার প্রয়োজন নাই—কেননা, উহা কুসংস্কার মাত্র।

এইরূপ ধারণাবশতঃ তোতাপুরী ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদি দেখিলে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিয়া বসিতেন। একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে ঠাকুরকে করতালি দিয়া 'হরিবোল হরিবোল', 'হরিগুরু', গুরুহরি, 'হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন' ইত্যাদি বলিতে বলিতে শ্রীভগবানের স্মরণ-মনন করিতে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে কেঁও রোটি ঠোকতে হো?'

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, 'দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি, আর তুমি কিনা বলচ—আমি রুটি ঠুক্‌চি!'

কিছুদিনের মধ্যেই পুরীজার বলিষ্ঠ শরীরে রোগের সঞ্চার হইল—রক্তামাশয় হইয়া ক্রমে উহা কঠিনাকার ধারণ করিল। ঠাকুর মথুরবাবুকে বলিয়া ঔষধপথ্যের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহাতে রোগের প্রকোপ বাড়িল বই কমিল না। তোতা মনকে সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের যন্ত্রণা ভুলিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে একদিন যন্ত্রণা এতই বাড়িয়া গেল যে, শুইয়া বা বসিয়া কোন অবস্থায়ই সোয়াস্তি পান না। মনকে শরীর হইতে টানিয়া লইয়া সমাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পেটের যন্ত্রণায় মন সেইদিকেই ছুটিল—সমাধিভূমিতে উঠিতে না উঠিতে নামিয়া পড়িতে লাগিল। পুরীজী শরীরের উপর ভীষণ চটিয়া গেলেন এবং হাড়মাসের খাঁচাটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া চিরতরে সকল যন্ত্রণার অবসান করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া তোতা জলে নামিলেন, কিন্তু কী আশ্চর্য, হাঁটিয়া প্রায় অপরপারে চলিয়া আসিলেও গঙ্গায় ডুবজল দেখিতে পাইলেন না! তখন অবাক্ হইয়া ভাবিলেন, 'এ কী দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার মত জলও আজ নদীতে নাই! এ কী ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা!'

"অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল। তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা, জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা!—

এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত!—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!" [লী ১।৮]

জগদম্বার অচিন্ত্য বিরাট রূপ দেখিতে দেখিতে তোতা গম্ভীর অম্বরবে দিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তৎপরে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া, সমস্ত রাত্রি মার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন। প্রাণ সমাধিস্থ—এক অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত—শরীরে যন্ত্রণার অনুভবমাত্র নাই।

প্রভাতে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হইলে তোতা রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিয়া কহিলেন, 'রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে—কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছি! এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া আমাকে এস্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি—তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন।' ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'মাকে যে আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট' বলে তর্ক করতে! এখন দেখলে, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বে বুঝিয়েছেন, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক নয় তেমনি।' [লী ১।৮] তোতা জগদম্বার মন্দিরে গিয়া শ্রীমূর্তির সম্মুখে ভক্তিভরে প্রণত হইলেন।

একদিন বীণাকণ্ঠ প্রভু গুণধর।
শ্যামাগুণ-গীত গান তোতার গোচর॥
ভাবেতে বিভোর তোতাপুরী যোগিবর।
গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে বক্ষের উপর॥
কোথায় আছিল তোতা এখন কোথায়।
ভাবরাজেশ্বর প্রভু—তাঁহার কৃপায়॥ [পুঁ]

শ্রীমৎ কেশবভারতীকে ভক্তিদান

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু হরিপ্রেমে একান্ত বিহ্বল।

করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥

... ...

কোন্ দিগে দণ্ডকমণ্ডলু বা পড়িল।
নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈল॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হৈয়া॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর বিষ্ণুভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ডকমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি॥

.. ..

এইমত সর্বরাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥ [ভা ৩।১]

'প্রেমে মাতোয়ারা' শিষ্যের সংসর্গে কেশবভারতীর জীবনে একদিনেই বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। জ্ঞানের সঙ্গে পরাভক্তি মিলিত হইয়া তাঁহার সিদ্ধিকেও সমধিক পূর্ণতা দান করিল। ইহাতে তাঁহার সমুদয় দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাইয়া গেল। একদিন—

প্রভু বোলে—জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহ ত করি দঢ়॥

কথোক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিল গৌরসুন্দরের স্থানে॥
ভারতী বোলেন—মনে বিচারিলে তত্ত্ব।
সভা হৈতে বড় দেখি ভক্তির মহত্ত্ব॥
প্রভু বোলে—জ্ঞান হৈতে ভক্তি বড় কেনে?
জ্ঞান বড় করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে॥
ভারতী বোলেন—তারা না বুঝে বিচার।
মহাজনপথে সে গমন সভাকার॥
বেদে শাস্ত্রে মহাজনপথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবশ যে অন্যপথে যায়॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ ব্যাস শুক।
সনকাদি নন্দ যুধিষ্ঠির পঞ্চরূপ॥

..

ভক্তি সে মাগেন সভে ঈশ্বরচরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে?

.. . ..

ভক্তি বড় শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
হরি বলি গর্জিতে লাগিলা প্রেমসুখে॥
প্রভু বোলে—আমি কথোদিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে॥
যদি তুমি জ্ঞান বড় বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্র ভিতরে॥ [ভা অা১

ভক্তির মহিমা কীর্তনে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু শ্রীমুখে ভক্তির মহিমা এইরূপে কীর্তন করিয়াছেন :

মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে ॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে ॥ [ভা ৩।৩]
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেম ধন। [চ ২।২৩]

ভগবান এই ভক্তি গোপন করিয়া রাখেন কেন, কে বলিবে! হয়তো সর্বেশ্বর হইয়াও ভক্তের কাছে তাঁহার স্বতন্ত্রতা থাকে না বলিয়া। পরাধীন হইতে কেহই চায় না, তিনিই বা কেন চাহিবেন? মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে বলিতেছেন :

ভক্তের আশ্রয়ে মুঞি থাকোঁ সর্বদায়।
ভক্ত বই আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই ॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি, স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিহ ভক্তবশ স্বভাব আমাব ॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব অবতার ॥
তিলার্ধেকো আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাও না থাকি সভে সত্য জান ইহা ॥ [ভা ৩।১]

ভক্তির মহিমা কীর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণ

মহাপ্রভুর ন্যায় ঠাকুরও ভক্তির মহিমা শতমুখে কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার কাছে কেহ শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করিলে গীতচ্ছলে উত্তর দিতেন :

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই,
শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই গো!
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়,
সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী ॥
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই,
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মিলে কই?
ভক্তির কারণে পাতালভবনে
বলির দ্বারে আমি দ্বারী হয়ে রই ॥
শুদ্ধা ভক্তি এক আছে বৃন্দাবনে,
গোপগোপী বিনে অন্যে নাহি জানে,
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে
পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥

ভগবান ভক্ত-পরতন্ত্র। আবার ভক্ত না হইলে তাঁহার চলেও না; কেননা, ভক্ত লইয়াই তাঁহার ভগবত্তার প্রকাশ। ঠাকুর বলিতেছেন:

"তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন।" [ক ৩।১৭।৪]

"ভক্তের জন্য লীলা। তাঁকে নররূপে দেখতে পেলে তবে তো ভক্তেরা ভালবাসতে পারবে, তবেই ভাই-ভগিনী, বাপ-মা সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে লীলা করতে আসেন!" [ক ৪।৯।৪]

"ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক, ভক্ত হন পদ্ম, ভগবান হন অলি! তিনি নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন, তাই রাধাকৃষ্ণলীলা।" [ক ৫।১০।২]

এই ভক্তি জ্ঞান হইতেও গরীয়সী। "জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে, ভক্তি অন্দর মহলে যায়।" [ক ৩।১২।২]

শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়

স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে জ্ঞান-ভক্তি-সমন্বয়াচার্য বলিয়াছেন। জগতে যত প্রসিদ্ধ ধর্মমত প্রচলিত আছে তাহাদের কোন কোনটি জ্ঞান-প্রধান—যেমন, অদ্বৈত বেদান্ত, বৌদ্ধ, সুফী; কোনটি বা ভক্তি-প্রধান—যেমন, ভাগবত বৈষ্ণব। জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয় বলিতে কাজেই বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় বুঝায়। কিন্তু এই সমন্বয়ের স্বরূপ কী, উহা কোন দার্শনিক মতবাদে পর্যবসিত হইয়াছে কিনা, তাহা ঠাকুরের জ্ঞান-ভক্তি-সম্পর্কিত বিভিন্ন উক্তি পর্যালোচনা করিয়া সম্যক্ ধারণা করা কঠিন। যাহা হউক, ভবিষ্য দার্শনিকের মননশীলতার সহায়তা হইলেও হইতে পারে ভাবিয়া এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

(১) বেদাতীত উপলব্ধি

নিজের কোন কোন গুহ্য দর্শনের কথা বিশিষ্ট ভক্তের কাছে বলিতে বলিতে ঠাকুর স্বগতভাবে বলিয়া উঠিতেন, 'এসব কথা কাকেই বা বলি, আর কেই বা বুঝবে!' কখনও বা বলিতেন, 'এখানকার অবস্থা বেদ-বেদান্তে যা লেখা আছে সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে।'

তাঁহার এতাদৃশ আরও উক্তি আছে: 'ঈশ্বর সাকার, নিরাকার, আরও কত কী।' 'তাঁর বড় ভাবটাও কেউ বুঝতে পারে না, ছোট ভাবটাও পারে না।' 'তিনি চিনির পাহাড়, শুকদেবাদি হদ্দ ডেঁও পিঁপড়ে!' নিজের অসমোর্ধ ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'[১]

---

[১] 'বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়' কথাটা ঠাকুর কী অর্থে বলিয়াছেন তাহা জানিতে চাহিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দকে পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি এই মর্মে উত্তর দেন: কেহ কেহ বেদান্তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, রাম, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য মানুষ বা জীব সকলেই যখন স্বরূপে ব্রহ্ম, তখন যে-কেহ ইচ্ছা করিলে রাম বা কৃষ্ণ হইতে পারে। ঠাকুরের উক্তির

মহাপ্রভুও কোন কোন কথায় বেদে অজ্ঞাত স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্রীমুরারি-গুপ্তের দেবগৃহে যজ্ঞবরাহের আবেশে 'স্বরূপং মে বদস্ব—আমার স্বরূপ বল' বলিয়া আদেশ করিলে গুপ্ত সবিনয়ে উত্তর দিয়াছিলেন :

নাহং বেদ্মি স্বরূপং তে ভগবান্ বনজেক্ষণ।
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ॥

হে কমলনয়ন, তুমি ভগবান—আমি তোমার স্বরূপ জানি না। হে পুরুষোত্তম, তুমি স্বসংবেদ্য—নিজেই নিজেকে জান। এই কথায় প্রসন্ন হইয়া ভগবান পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'কিং মাং জানাতি বেদোঽয়ম্? —বেদ আমাকে জানে কি?' গুপ্ত উত্তর দিলেন, 'বেদস্য শক্তির্নাস্তি ত্বাং বক্তুং গুহ্যোঽসি সর্বদা—আপনাকে ব্যক্ত করিবার শক্তি বেদের নাই, আপনি সর্বদাই গুহ্য।' তাহা শুনিয়া ভগবান কহিলেন, 'বেদো বিড়ম্বয়ত্যালম্—মাং বক্তাপাণিপাদেতি। নহি জানাতি বেদো মামিতি নিশ্চিতমেব হি—বেদ আমাকে যথেষ্ট বিড়ম্বনা করে—বলে, আমার হাত নাই, পা নাই। বেদ আমাকে জানে না, ইহা নিশ্চিত।' [মু ২।২] অন্যত্র বলিতেছেন :

কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্তন-কারণে ॥ [ভা ৩।১]

(২) জ্ঞানী ও ভক্ত : তাঁহাদের অনুভূতির স্বরূপ

ঠাকুরের উক্তি হইতে জানা যায়, সাধকেরা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—শিবাংশ ও বিষ্ণু-অংশ। উভয়ের প্রকৃতি, আচারব্যবহার ও

মানে এই যে, যিনি ঈশ্বর তিনি চিরকালই ঈশ্বর, নরদেহে অবতীর্ণ হইলেও তিনি ঈশ্বরই থাকেন, কখনও জীবত্ব প্রাপ্ত হন না। জীব সাধনভজন করিয়া বড় জোর ব্রহ্মে লীন হইতে পারে, কিন্তু হাজার চেষ্টা করিয়াও জীব ঈশ্বর হইতে পারে না।

ভজনানুরাগে পার্থক্য আছে, শিবাংশে জ্ঞানের ভাব ও বিষ্ণু-অংশে ভক্তির ভাব প্রবল হয়—স্বভাবতঃ তাঁহারা জ্ঞান বা ভক্তির দিকে ঝুঁকিয়া থাকেন।

ভক্তি বা জ্ঞান যে পথেরই পথিক হউন না কেন, সকলেই শেষে একস্থানে পৌঁছিয়া থাকেন। জ্ঞানপথে যেমন অবিদ্যার নাশ হয়, ভক্তিপথেও তেমনি। অবিদ্যার নাশই মুক্তি। অবিদ্যা নষ্ট হইলে বিদ্যা বা জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞান সকলেরই স্বরূপভূত বস্তু; সুতরাং জ্ঞান যায় না। সেই জ্ঞানে সর্বত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ং' চিৎস্বরূপের স্ফুরণ বা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন হয়। ঠাকুর বলিতেন, 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর।' 'শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধাভক্তি এক।'

সমাধি ব্যতীত স্বরূপ-জ্ঞান জন্মে না। সাধারণতঃ সমাধি দুই প্রকার—সবিকল্প বা চেতন, এবং নির্বিকল্প বা জড়। জ্ঞানী নির্বিকল্প সমাধিতে চরম স্বরূপানুভূতি লাভ করেন। সাধারণতঃ তিনি ঐ সমাধি হইতে ফিরেন না বা ব্যুত্থিত হন না। একুশ দিন নিরন্তর ঐ অবস্থায় থাকিলে তাঁহার শরীর শুষ্কপত্রের মত ঝরিয়া পড়িয়া যায়। তিনি কৈবল্য, বিদেহমুক্তি বা ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। সে অবস্থা বাক্যমনের অতীত—দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত। তাহাকে 'একও বলা যায় না, দুইও বলা যায় না'; আবার 'অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না'। কেননা, 'অস্তি নাস্তি ইত্যাদি প্রকৃতির গুণ'; সে অবস্থা প্রকৃতির পারে—নির্গুণ। প্রথম হইতেই জ্ঞানপথ বা বিচারপথ না ধরিলেও, বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে ক্রমশঃ জ্ঞান উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ হইতে পারে। 'বৈধী ভক্তির পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর লয়।'

মুক্ত পুরুষদের অধিকাংশই এই লয় বা নির্বাণ লাভ করেন। তাঁহারা আর সংসারে ফিরেন না, তাঁহাদের ফিরিবার ইচ্ছাও থাকে না। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মুক্ত পুরুষ আছেন যাঁহারা নির্বাণমুক্তি কামনা করেন না। তাঁহারা নির্বিকল্প সমাধিতে পৌঁছিয়াও উহা হইতে ফিরিয়া আসিতে

পারেন ও আসিয়া থাকেন। স্বয়ং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইয়াও তাঁহারা সচ্চিদানন্দ ভগবানকে অহৈতুকী ভক্তি করেন। একমাত্র তাঁহাদের পক্ষেই অহৈতুকী ভক্তি করা সম্ভবপর ; কেননা, তাঁহারা আপ্তকাম। তাঁহাদের সম্বন্ধেই শ্রীমদ্ভাগবত 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ' ইত্যাদি কথা বলিয়াছেন। ভগবানও তাই ইঁহাদের প্রেমে চির-আবদ্ধ। ঠাকুরের কথায়, ইঁহারা ঈশ্বরের বিশিষ্ট অংশ বা ঈশ্বরকোটি। ইঁহারা ঈশ্বরলীলার বা ঈশ্বরের অবতারলীলার—নরলীলার নিত্যসহচর। পৃথিবী সময়ে সময়ে ইঁহাদের পদস্পর্শে পবিত্র হইয়া থাকেন। 'নিত্যতে পৌঁছে আবার লীলায় থাকা, যেমন ওপারে গিয়ে আবার এপারে আসা, লোকশিক্ষা আর বিলাসের জন্ম—আমোদের জন্য।' [ক ৮।৩২।১]

এই অবস্থা সগুণ হইয়াও ত্রিগুণাতীত, অর্থাৎ প্রকৃতির দোষগুণ হইতে মুক্ত। 'ত্রিগুণাতীত ভক্ত আছে—নিত্যভক্ত, যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক—নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভক্ত, নিত্য ধাম।' সর্বত্র চিৎস্বরূপের স্ফূর্তি থাকায় এই অবস্থাকে এক প্রকার সমাধিস্থিতি বলা যায়। 'ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতন-সমাধি বলে। এতে সেব্যসেবকের আমি থাকে—রসরসিকের আমি—আস্বাদ্য-আস্বাদকের আমি। ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক ; ঈশ্বর রসস্বরূপ, ভক্ত রসিক ; ঈশ্বর আস্বাদ্য, ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি খেতে ভালবাসি।' [ক ৩।৯।৩]

ভক্ত ও জ্ঞানী উভয়েই এক সচ্চিদানন্দকে দর্শন বা অনুভব করেন, তবে এই দর্শনের প্রকারভেদ আছে। একজন যেন একপাশ হইতে ঘরকে দেখেন, অপরে ঘরের মধ্য হইতেই ঘরকে দেখেন। 'একপাশ থেকে ঘরকে দেখছি এও যা, আর ঘরের মধ্য থেকে ঘরকে দেখছি সেও তাই।' [ক ২।২৫।২] তথাপি ঐ দর্শনের প্রকারভেদে সচ্চিদানন্দস্বরূপের স্ফূর্তিতে ভাবের তারতম্য ঘটে। 'জ্ঞানীর ঈশ্বর তেজোময়, ভক্তের রসময়।' [ক ২।২৪।৩]

(৩) 'জ্ঞানের পর বিজ্ঞান' : নিত্যসাকার

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত কতকগুলি উক্তি এইরূপ :

"হরিই সেব্য, হরিই সেবক—এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি করে, হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারপরে সেই দেখে যে হরিই এই সব হয়েচেন, ঈশ্বরই মায়া, জীব, জগৎ এইসব হয়েচেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। এইটি পুরাণের মত।···

"তবে কেউ বলতে পারে সচ্চিদানন্দ এত শক্ত হল কেমন করে—এই জগৎ টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই যে, শোণিত-শুক্র এত তরল জিনিস, কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব মানুষ তৈয়ারি হচ্চে। তাঁ হতে সবই হতে পারে। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে তারপর নেমে এসে এই সব দেখা।" [ক ৩।৮।১]

"ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে—জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাস্যভাবে, মধুরভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তিনি হয়েচেন এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।" [ক ৩।৬।৪]

"কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে সব চিন্ময়—কোশাকুশী, বেদী, ঘরের চৌকাট—সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দিকে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলাম—যা দেখি তাই পূজা করি।" [ক ৩।৮।১]

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা—যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তিনিই লীলার জন্য নানারূপ ধরেচেন। ব্রহ্ম অটল অচল সুমেরুবৎ। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।" [ক ৩।৯।১]

"নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য।··· চোখ বুজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই? ··· কেউ সাত তলার উপরে উঠে

আর নামতে পারে না, আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে।" [ক ৩।১৬।১]

এক সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুরের 'তুই কী চাস?' প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকব।' তাহাতে ঠাকুর বলেন, 'তুই তো বড় হীনবুদ্ধি। সমাধির পারে যা। সমাধি তো তুচ্ছ কথা!' [ক ৩।পরিশিষ্ট]

নিত্য ও লীলা একসঙ্গে দর্শন হইতে পারে। ঠাকুরের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন, "কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই দেখেন। রাসলীলা যখন হচ্ছিল তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, 'সখি, বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি।' বেদান্তসিদ্ধান্ত কিনা সেই পরব্রহ্ম—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক। আর একটা আছে নিত্য লীলা দুইয়েরই পার।"[২]

একদা জনৈক ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'ভক্ত—এর এককালে তো নির্বাণ চাই?' ঠাকুর উত্তর দেন, "নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এই রকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভক্ত, চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম। যেমন চন্দ্র যেখানে তারাগণও সেখানে। বিষ্ণু-অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিলুম, এগার মাস বেদান্ত শুনালে। কিন্তু ফিরে ঘুরে সেই 'মা মা'।" [ক ৩।১৬।১]

যাহাকে ঠাকুর 'অখণ্ডের ঘর' বলিয়াছেন, সেই নির্বিকল্প-সমাধিমান মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ইষ্টের রূপ নিত্য বলিতেন। কথা-প্রসঙ্গে স্বামী শিবানন্দ বলিয়াছিলেন: "এসব কথা কোনো বইতে পাবে না, এ শুধু এখানকার কথা। স্বামিজী বলতেন, আমার ইষ্টের রূপ নিত্য, নিত্যসাকার।' ঠাকুর বলতেন, এমন জায়গা আছে, যেখানে বরফ গলে না।' Perpetual snow (চিরস্থায়ী তুষার)। সেই

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

Absoluteই (নির্গুণ ব্রহ্মই) নিত্যসাকার রূপ ধরে আছেন।"[৩] স্বামী জগদানন্দের কাছে শুনিয়াছি, স্বামিজী নাকি প্রস্তরে খোদিত এক নারায়ণ-মূর্তি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'This is my God Absolute' (এই আমার নির্গুণ ব্রহ্ম)। 'অখণ্ডের ঘরে' নিত্যসাকারের কথা ঠাকুরের এক দর্শন-বৃত্তান্ত হইতেও অবগত হওয়া যায়। ঠাকুর বলিয়াছিলেন :

"একদিন দেখিতেছি—মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থূল জগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল, ততই নানা দেবদেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। ক্রমে উক্ত রাজ্যের চরম সীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম, এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল। দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবীসকল পর্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূর নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব ত দূরের কথা দেবদেবীকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্রবিরহিত সমরস জ্যোতি-র্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্য শিশুর আকারে পরিণত হইল।

৩ মহাপুরুষজীর কথা।

ঐ দেবশিশু ইঁহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণপূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল; পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বানপূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'আমি যাইতেছি, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।' ঋষি তাঁহার ঐরূপ অনুরোধে কোন কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল। পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতির আকারে পরিণত হইয়া বিলোমমার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে। নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম, এ সেই ব্যক্তি।" [লী ৫।৪]

ঠাকুরের মত

ঠাকুরের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্তিসমূহ পর্যালোচনা করিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, উহারা পূর্ব হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোন দার্শনিক মতবাদে পর্যবসিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, ঠাকুরের মতকে শ্রীশঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ—যে মতে, 'জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত' বা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' সেই মত—বলা যাইতে পারে না। বিবর্তবাদে নিত্যসাকার থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে যে বিষয়ের অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি থাকে সেই বিষয়ে শাস্ত্রের তাৎপর্য অবধারিত হয়।

ঐশ্বরিক কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর 'যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা' ইত্যাদি কথা বারবার বলিয়াছেন দেখা যায়। 'জগৎ কি মিথ্যা?'—এই সুস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, 'মিথ্যা কেন? ওসব বিচারের কথা।' [ক ৪।৭।৩] 'সাধনের সময় নেতি-নেতি করে ত্যাগ করতে হয়; তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েচেন।' [ক ৪।৭।২] 'নিত্যে পৌঁছে লীলায় থাকা ভাল।…লীলাও সত্য।' [ক ২।৭।২] 'বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'; কিন্তু 'এখানকার অবস্থা বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে চলে গেছে!'

ঠাকুরের নিজের সম্পর্কে উক্তিবিশেষ হইতেও জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি বলিতেন, 'আমার মুক্তি নাই, সরকারী কর্মচারী—জমিদারির যেখানে গোলমাল উপস্থিত হবে, সেখানেই ছুটতে হবে।' জমিদারি সত্য না হইলে, তাঁহার মুক্তিপক্ষে বাধা কী?

শ্রীজীব-গোস্বামি-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদকেও ঠাকুরের মত বলিয়া মানিতে পারা যায় না। ঠাকুর ভেদাভেদ-বর্জিত নির্গুণ অবস্থাও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ঐ মতবাদে যে 'নির্বিশেষ ব্রহ্ম' স্বীকার করা হয়, উহা অব্যক্তশক্তিক বা সগুণ। আবার ঐ ব্রহ্মকে কোথাও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রভা বা অঙ্গকান্তি, কোথাও বা নারায়ণাদি ঈশ্বর-বিগ্রহসকলের নিত্যধাম 'পরব্যোমে'র বহিঃস্থ জ্যোতি-র্মণ্ডল—নামান্তরে 'সিদ্ধলোক'—বলা হইয়াছে। ঠাকুরের কথায় উহার সমর্থন পাই না। তিনি কোথাও নির্বিশেষকে সবিশেষ হইতে খাট করেন নাই।

এতাবৎকাল পর্যন্ত বিবর্তবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ অবলম্বনে কেহ কেহ ঠাকুরের সর্বধর্ম-সমন্বয় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া আমরা ঐ দুইজাতীয় ব্যাখ্যার প্রতিকূলে ইঙ্গিতমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। ভবিষ্য দার্শনিক ঠাকুরের মতবাদ লইয়া যে দর্শন রচনা করিবেন তাহাতে ঠাকুরের শ্রীমুখোক্ত সকল কথার সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে।

আলোচ্য বিষয়ে স্বামী শর্বানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী তুরীয়ানন্দ যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ঠাকুরের মত বলা বড় সোজা নয়। তবে আমার মনে হয়, সকল ধর্মমতকে উৎসাহিত করবার জন্য তিনি বলেছেন— 'যত মত তত পথ।' সকল মত তিনি নিজে সাধন করে, এক সত্যে পৌঁছান যায় অনুভব করে, তবে ঐ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। পারমার্থিক সত্য এক অদ্বৈত, যাঁকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান ইত্যাদি অনেক নামে অভিহিত করা হয়। রুচির বিচিত্রতা অনুসারে সেই এককেই যিনি যেরূপভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনি সেরূপ ভাব ব্যক্ত করবার চেষ্টা করে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। তথাপি তাঁর সবটা বলতে পারেন নি। 'তিনি যা তিনি তাই'—এই বলে গেছেন। অবস্থাবিশেষে গৌড়পাদের অজাতবাদ, শঙ্করের বিবর্তবাদ, অন্যের পরিণামবাদ অথবা শিবাদ্বৈতবাদ—সকলই সত্য এবং এসমস্ত ছাড়া তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচরম্'। এঁরা সকলেই তপস্যার দ্বারা ভগবৎকৃপায় আদিষ্ট হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বাদ প্রচার করেছিলেন। তাঁকে লয়েই সকল বাদ, তিনি বাদ-বিচারের পার।

"এই সত্যটি প্রকাশ করাই যেন ঠাকুরের মত বলে মনে হয়। 'দেহবুদ্ধ্যা দাসোঽস্মি তে জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ। আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেবাহম্ ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ॥'[৪] ইহাই তিনি উত্তম সিদ্ধান্ত বলে প্রকাশ করতেন। আর চিন্ময় কোশাকুশী কেন হবে না? 'ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্'—তিনি ভিন্ন ত কিছুই নাই, সবই ত তিনি। আমরা তাঁকে না দেখেই ত অন্য জিনিস দেখি, নতুবা তিনিই সব। নামরূপ তো তাঁ থেকেই এবং এক তাঁতেই তরঙ্গ, ফেন, বুদবুদ, জল ছাড়া তো কিছুই

৪ 'তুমি আমাকে কিভাবে দেখ?'—শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাবীর বলিয়াছিলেন : 'যখন মনে হয় আমি দেহমাত্র, তখন দেখি তুমি প্রভু, আমি দাস; যখন ভাবি যে আমি একটি জীব, তখন দেখি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া ধারণা করি, তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি,- ইহা আমার নিশ্চিত মত।

নেই। এতে তোমার বিবর্তবাদ থাক আর যাক। এ সত্য যিনি দেখেছেন তিনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তবে আবার ঠাকুরের এমন অবস্থা হতো যখন তিনি ভাবাতীত হয়ে যেতেন, তখন রূপ নাম থাকতো না, তার পারে যেতেন, সে 'অবাঙ্‌মনসোগোচরম্‌' অবস্থা। সেও বিবর্তবাদ প্রভৃতির পার। তখনও কিন্তু সেই একই আছেন অদ্বৈত, আর কিছুই নেই, সেখানে বিবর্ত কোথায়? অজাতই বা কোথায়? বিবর্ত, অজাত, পরিণাম প্রভৃতি সব তাঁতেই হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য, আবার তা থেকে যে জীবজগৎ হচ্ছে তাও সত্য, যদি তাঁকে না ভুলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল কেন? না, তারা থাকে না এইজন্য। কিন্তু যদি তাঁকে মনে থাকে তবে বুঝতে পারি, 'মাঝেরই খোল ও খোলেরই মাঝ।' 'ময়া ততমিদং সর্বং', 'ময়ি সর্বমিদং প্রোতং' ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়।

"আসল কথা, তাঁকে দেখতে হবে, তাঁকে দেখলে আর কিছু থাকে না। তিনি সবময় বোধ হয়ে যায়। তাঁকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদবিবাদ, তাঁকে জানলে সব গোল মেটে, কোন বাদই আর তখন থাকে না, মাত্র তিনিই থাকেন। তিনিই এক পারমার্থিক সত্য, তাঁকে আশ্রয় করেই সকল মতবাদ, তাঁকে পেলেই সব শান্তি। কোনওরূপে তাঁকেই পেতে হবে, এই ঠাকুরের মত। 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর', অর্থাৎ তাঁকে লাভ করে যেমন অভিরুচি যে কোনও বাদ নিয়ে থাক, কোনও ক্ষতি হবে না। তবে তাঁকে জানলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী, বন্ধন থাকে না। তারপর শরীর গ্রহণ—মরণান্তে আপন আপন রুচির উপর নির্ভর করছে। যারা নির্বাণ গ্রহণ করবে, তারা জগৎ স্বপ্নবৎ জেনে একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মে মন সমাধান করে জ্যোতির্মাত্রে লয় হয়ে যাবে। আর যারা প্রভুর ভক্তি নিয়ে থাকবে, তারা জগৎকে তাঁর বিভূতি জেনে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে তিনি, তাঁর লীলার খেলুড়ে হয়ে বারংবার শরীর ধারণ করতে কাতর হবে না;

তাঁরা আত্মারাম হয়ে তাঁতে অহেতুকী ভক্তি করবে, নিবাণাদি দিতে চাইলেও গ্রহণ করবে না।"

শুদ্ধাভক্তির অধিকারী

ভক্তি-প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিতেছি। বিষয়টি এই, যে-কেহ শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইতে পারে কিনা? কেননা, মহাপ্রভু বলিয়াছেন, 'মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।' ঠাকুরও বলিয়াছেন, 'শুদ্ধাভক্তি দিতে কাতর হই!' উত্তরে, ঠাকুরেরই কথা-প্রমাণে বলিতে হয়, সংসারে নিবাণকামী সাধকের সংখ্যাই সর্বাধিক, প্রবর্তক অবস্থায় যাঁহাকে ভক্তিকামী বলিয়া মনে হয়, সিদ্ধাবস্থায় তিনিও মোক্ষকামী হইয়া পড়িতে পারেন ও পড়েন। জন্মজন্মান্তরের তীব্র দহনজ্বালার স্মৃতি তাঁহাকে 'ভয়ত্রাসে' করিয়া তুলে কিনা, কে বলিবে! অপরদিকে, মোক্ষের আনন্দাতিশয্যও হয়তো এমনভাবে তাঁহাকে আকর্ষণ করে যে, তিনি আর ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হন না—রাখিবার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

তথাপি স্বয়ং ভগবান যেখানে ভক্তির মাহাত্ম্যপ্রচারক, সেখানে কেহ না কেহ নিশ্চয়ই অকপটে ভক্তিকামী হইবে। আর যদি তাহাই হয়, শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার মনস্কামনা পূর্ণও হইবে।

ঠাকুরের মুখে 'চিনি হব না; চিনি খেতে ভালবাসি' একথা শুনিয়া পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রশ্ন করেন, "তিনি যদি সব 'আমি' লয় করেন তা হলে কী হবে? চিনি যদি করে লন?" ঠাকুর উত্তর দেন, "তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার শাস্ত্রে নাই? তাঁরা জ্ঞানী হয়েও 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছিল। প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।" [ক ৩।৯।৩]

নটকবি ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'একটি সাধ—অহৈতুকী ভক্তি!' উত্তরে ঠাকুর 'অহৈতুকী ভক্তি ঈশ্বরকোটির হয়, জীবকোটির হয় না' বলিয়াই আনমনে গান ধরেন,—শ্যামাধন কি সবাই পায়,······নিগুর্ণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়! [ক ৩।১১।২]

ঠাকুর তাঁহার ভক্তগণের মধ্যে তিন শ্রেণী নির্দেশ করিতেন—অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ ও রসদ্দার। বহিরঙ্গ ও রসদ্দারের কথা দূরে থাকুক, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মধ্যেও সকলেই ঈশ্বরকোটি বা সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছিলেন না। ঠাকুরের কৃপায় কেহ কেহ হয়তো 'জ্ঞান ও প্রেমে, ত্যাগ ও পুণ্যে' বর্ধিত হইয়া কালে ঐ থাকে উন্নীত হইয়াছেন বা হইবেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে কেহ কেহ শুনিয়াছেন যে, ঐরূপই হইয়া থাকে। স্বামিজী ঠাকুরের কাছে শুনিয়া থাকিবেন।

একদা লেখক ঠাকুরের অন্তরঙ্গভক্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার শ্রীম'কে এই মর্মে প্রশ্ন করিয়াছিল,—'ঠাকুর কথামৃতের অনেকস্থলে শুদ্ধাভক্তির মহিমা কীর্তন করিয়াছেন, অথচ স্পষ্টই বলিয়াছেন, শুদ্ধাভক্তি জীবকোটির হয় না। যদি তাহাই হইবে—মাত্র একশ্রেণীর কতিপয় ভক্তের জন্যই উহা চিরকাল সংরক্ষিত থাকিবে, তবে এত করিয়া সকলের কাছে পুনঃপুনঃ উহা বর্ণনা করিলেন কেন?' কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া শ্রীম আস্তে আস্তে কহিলেন, 'এক জন্মে না হলেও কয়েক জন্মে হতে পারে।' অর্থাৎ কয়েক জন্মের ঐকান্তিক কামনা ও একনিষ্ঠ সাধনায় জীবকোটি ঈশ্বরকোটিত্ব লাভ করিতে পারে।

নবম অধ্যায়

মাতৃভক্তি ও গঙ্গাভক্তি

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই মাতৃভক্তি জাহ্নবীধারার ন্যায় পবিত্র ও পাবনকরী; আর তাঁহাদের গঙ্গাভক্তি সংসার-দাবদগ্ধ নরনারীর ত্রিতাপজ্বালার শান্তিকরী। এই দুই বিষয়ে উভয় মহাপুরুষের আচরণের সমতা অনুধাবনযোগ্য।

•

শ্রীচৈতন্যের মাতৃভক্তি

জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীবিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন। শ্রীবিশ্বম্ভর তখনও কৈশোর অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু এই বয়সেই মাতাপিতার বেদনা মর্মে অনুভব করিলেন; বালচাপল্য ছাড়িয়া কিছু দিনের জন্য ধীরস্থির হইয়া গেলেন; আর—

নিরবধি থাকে মাতাপিতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী জনকে। [ভা ১।৫]

উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীবিশ্বম্ভর অধ্যয়নে মন দিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিলেন। পিতৃহীন হইয়া তিনি অনেক কাঁদিলেন এবং জননীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন:

শুন মাতা, মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥ [ভা ১।৬]

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিবেন। অনেক করিয়া মাকে আগেই বুঝাইয়াছেন। চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে যখন ঘর ছাড়িয়া যাইবেন, জননীর হাত ধরিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন:

বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ॥

আপনার তিলার্ধেকো না লইলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলা ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি জন্মেও নারিব শুধিবার॥

... ...

শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশদিন অন্তরে, কি এখনে বা আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার॥
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বারবার---।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥

অনন্তর জননীর পদধূলি শিরে ধরিয়া, জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিলেন। [ভা ২।২৬]

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের ঘরে আসিয়াছেন। অদ্বৈতপ্রভুর ব্যবস্থায় নবদ্বীপ হইতে তাঁহার জননী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র মহাপ্রভু, দূরে থাকিতেই, দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং জননীকে সাক্ষাৎ বিশ্বজননী জ্ঞানে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে করিতে স্তব করিতে লাগিলেন:

তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে সে গুণাতীত সত্ত্বরূপা কহি॥

তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতিমতি॥
তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণুভক্তি।
যাহা হৈতে সব হয় তুমি সেই শক্তি॥

... ...

যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।
পালহ তুমি সে, তোমাতে সে লীনো হয়॥
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কার।
সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার॥ [ভা ৩৪]

পুরীতে অবস্থানকালে মহাপ্রভু প্রিয়পার্ষদ পণ্ডিত জগদানন্দকে প্রতি বৎসর নবদ্বীপে মার কাছে পাঠাইতেন। মাকে দিবার জন্য ৺জগন্নাথের প্রসাদী বস্ত্র ও উত্তম প্রসাদ সঙ্গে দিতেন ; আর সেই সঙ্গে বলিতেন :

......মাতাকে কহিয় নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিয় তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেই দিনে আসি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্মনাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব' তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥ [চ ৩১০]

শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি

সাত বৎসর বয়সে শ্রীগদাধর পিতৃহারা হইলেন। কৈশোর পিতৃস্নেহ অনুভব করিবার শ্রেষ্ঠ সময়; তাঁহার অভাববোধ তীব্র হইয়া উঠিল। কিন্তু জননীর দিকে চাহিয়া, ছেলেকে সর্বদা বিষণ্ণ দেখিলে জননী আরও মর্মপীড়িতা হইবেন বুঝিয়া, তিনি বাহিরে চাপিয়া গেলেন এবং বাহ্যতঃ পূর্বের ন্যায় হাস্যকৌতুকে কাল কাটাইতে লাগিলেন। মা দিতে পারিবেন না এমন কোন জিনিসের জন্য তাঁহাকে আর আব্দার করিয়া ধরিতেন না, মার কাছে কাছে থাকিতেন এবং দেবসেবায় ও ঘরের কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন।

বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের সাধনায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়—এইকথা শ্রীমৎ তোতাপুরীর মুখে শুনিয়া ঠাকুর কহিলেন, 'যদি গোপনে করলে চলে, তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমার বুড়ো মা অনেক শোক পেয়েচেন, সন্ন্যাসের কথা জানতে পারলে তাঁর প্রাণে বিষম আঘাত লাগবে। আমি তা কিছুতেই করতে পারব না।' তোতাপুরী বলিলেন, 'উত্তম কথা।'

ঠাকুরের জননী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর নহবত-ঘরে বাস করিয়াছিলেন। ঠাকুর ফুলচন্দন লইয়া মাকে পূজা করিতেন এবং নিত্য স্বহস্তে মার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। সেই জগতের মা-ই মা হয়ে এসেচেন, তিনি বলিতেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনে গিয়াছেন। সিদ্ধপ্রেমিকা গঙ্গামায়ী নিধুবনে থাকিতেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। ঠাকুরের অঙ্গে মহাভাবের প্রকাশ দেখিয়া গঙ্গামায়ী তাঁহাকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধা জ্ঞান করিলেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ তপস্যা এতদিনে সফল হইল ভাবিয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। সেই আদরের 'দুলালী'কে তিনি আর কিছুতেই ছাড়িয়া দিবেন না। এদিকে ঠাকুরও গঙ্গা-মার প্রেমে বিমোহিত। স্থির হইল, ঠাকুর ব্রজে

গঙ্গা-মার কাছেই থাকিয়া যাইবেন, আর দেশে ফিরিবেন না। অনুগত ভক্ত মথুরানাথ তাহাতে প্রমাদ গণিলেন এবং কেমন করিয়া ঠাকুরকে দেশে ফিরাইবেন, হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিলেন। শেষকালে ঠাকুরের দুই হাত ধরিয়া হৃদয় ও গঙ্গা-মার মধ্যে টানাটানি আরম্ভ হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া হৃদয় ঠাকুরের বুড়ো মা যে বহুদূরে দক্ষিণেশ্বরে আছেন, এই কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। অমনি ঠাকুরের মন ঘুরিয়া গেল। সকলের উপরে মাতৃভক্তির জয়জয়কার হইল।

কামারপুকুর হইতে ঠাকুরের মেজ ভাই শ্রীরামেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে। ঠাকুর তৎক্ষণাৎ মন্দিরে যাইয়া জগদম্বার নিকট কাতর প্রার্থনা করিলেন তাঁহার বৃদ্ধা মাকে শোকের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াইয়া দেয়, জগন্মাতা শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর মন তেমনি উচ্চগ্রামে চড়াইয়া রাখিলেন। পার্থিব শোকদুঃখ তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিল না। 'সংসার অনিত্য' ইত্যাদি কথা কহিয়া তিনি পুত্রকেই সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পরে জননীর কাছে বসিয়া ঠাকুর নিজের পূর্ব-জীবনের নানাকথা তুলিয়া বৃদ্ধার মন আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুইপ্রহর পর্যন্ত মাকে কত গল্পই শুনাইলেন। রত্নগর্ভা জননী রত্নপুত্রের শ্রীমুখে তাঁহারই বাল্যলীলাকথা শুনিতে শুনিতে যখন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন, তখন তাঁহাকে শয়ন করাইয়া ঠাকুর নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। অতঃপর জননী আর তিনদিনমাত্র এই সংসারে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা ছিল না। যখন তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল, ঠাকুর ফুল-চন্দন-তুলসী লইয়া মার পাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন। মার জন্য অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিলেন। সন্ন্যাসীর বৈধকর্মে অধিকার নাই; তথাপি মার পুত্রোচিত কোন কাজই করিতে পারিলেন না ভাবিয়া একদিন তর্পণ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইলেন না। ভাবাবেশে অঙ্গুলি

অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল পড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে জননীকে নিজের অসামর্থ্য নিবেদন করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবী বলিয়াছিলেন শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে : শাশুড়ীর মৃত্যুর সময় বলতে লাগলেন, 'মাগো, তুমি কেগো, তুমি আমায় গর্ভে ধারণ করেছিলে! মা, একরূপে এতদিন দেখলি, এখন যেন দেখিস।' শাশুড়ীর মৃত্যুর পর একদিন খাবার পূর্বে বল্লেন, 'দাঁড়াও, আমি মার জন্যে পঞ্চবটীতে একটু কেঁদে আসি।'

ঠাকুরের শ্রীমুখে তাঁহার ভক্ত সন্তানেরা কতদিন শুনিয়াছেন : "সংসারে বাপ-মা পরম গুরু। যতদিন বেঁচে থাকেন, যথাশক্তি তাঁদের সেবা করতে হয়, আর মরে গেলে যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করতে হয়। যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রাদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাঁদতে হয়; তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়।

"যতক্ষণ মা আছেন, তাঁকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের ওপর আছে, মার ওপরও নিতে হবে।"

শ্রীচৈতন্যের গঙ্গাভক্তি

ছাত্রজীবনে শ্রীবিশ্বম্ভর গঙ্গাস্নান করিয়া মাল্যচন্দন লইয়া গঙ্গাপূজা করিতেন। অধ্যাপক-জীবনে পদ্মাতীর হইতে ফিরিয়া আসিয়া—

.. ... সর্বগণের সহিতে।

গঙ্গারে হইলা দণ্ডবত বহুমতে॥ [ভা ১।১০]

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু রাঢ়দেশে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পুনরায় পূর্বাভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন। পথে কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া দারুণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, আচম্বিতে এক রাখালশিশু হরিধ্বনি করিয়া উঠিতেই তাঁহার ক্ষুণ্ণভাব দূর হইল। বলিলেন :

দিন তিনচারি যত দেখিলাঙ গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলুঁ হরিনাম॥

আচম্বিতে শিশুমুখে শুনি হরিধ্বনি।
কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি ?
··· গঙ্গা কতদূর এথা হৈতে ?
সভে বলিলেন—এক প্রহরের পথে ॥
প্রভু বোলে—এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের সঞ্চার ॥
গঙ্গার বাতাস কিবা লাগিয়াছে এথা।
অতএব শুনিলাঙ হরিগুণগাথা ॥

গঙ্গার মহিমা বলিতে বলিতে মহাপ্রভুর গঙ্গাস্নানের ইচ্ছা বলবতী হইল। 'মত্তসিংহপ্রায়' গঙ্গার অভিমুখে ধাইয়া চলিলেন ও সন্ধ্যাগমে গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তারপরে—

নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
গঙ্গা গঙ্গা বলি বহু করিলা ক্রন্দন ॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃপুনঃ স্তুতি করি করেন প্রণাম ॥ [ভা ৩।১]

পুরীতে মহাপ্রভু প্রিয়ভক্ত সার্বভৌম ও তাঁহার ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতিকে বলিয়াছিলেন :

দারু-জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি ॥
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হয় জলব্রহ্ম সম ॥
সার্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন ॥ [চ ২।১৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের গঙ্গাভক্তি

ঠাকুরের পিতা শ্রীখুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী ও অশূদ্রযাজী ছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামকুমার যখন রাণী রাসমণির দেবালয়ে পূজকের পদ লইলেন, শ্রীগদাধর তখন বংশগত নিষ্ঠাবশতঃ তথায় অন্নগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তাহাতে রামকুমার বলিলেন, 'তবে সিধা নিয়ে গঙ্গাগর্ভে পঞ্চবটীতে নিজের হাতে রেঁধে খাও। গঙ্গাগর্ভে সকল বস্তুই পবিত্র—একথা তো মান?' বালক না মানিয়া পারিলেন না। গঙ্গা-ভক্তির কাছে আহারের ঐকান্তিক নিষ্ঠা পরাজিত হইল।

ঠাকুর বলিতেন, 'গঙ্গাজল জলের মধ্যে নয়, শ্রীবৃন্দাবনের রজঃ ধুলোর মধ্যে নয়, আর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ অন্নের মধ্যে নয়। এই তিন ব্রহ্মের স্বরূপ।'

বলিতেন: 'নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি! গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূত বাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয়কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে ততদূর পর্যন্ত পবিত্র ভূমি। ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বরভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত।' [লী ৩।১]

কেহ হয়তো অনেকক্ষণ বিষয়কথা কহিয়াছে, বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে, ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেন ও বলিতেন, 'যা, কয়েক আজলা গঙ্গাজল খেয়ে আয়!' বিষয়ী লোকের বিষয়চিন্তায় বা স্পর্শে কোন স্থান অপবিত্র হইয়াছে দেখিলে সেবককে বলিতেন, 'এখানে বেশ করে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে।' কখনো বা নিজের হাতেই ছিটাইয়া দিতেন। গঙ্গায় নামিয়া কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে ব্যথা পাইতেন ও উহা করিতে নিষেধ করিতেন।

দশম অধ্যায়

বিবিধ বিষয়ে সাদৃশ্য

১। মাতাপিতা

শ্রীবিশ্বম্ভর ও শ্রীগদাধর উভয়েই সদব্রাহ্মণকুলে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই পিতা শাস্ত্রীয় সদাচারে নিষ্ঠাবান, সরল, সত্যবাদী, পরোপকারী, তেজস্বী, তীর্থ-ব্রতাদি-পরায়ণ, বিশেষতঃ ৺রঘুনাথ-ভক্ত। মাতা পিতার অনুরূপ গুণসম্পন্না, বিশেষতঃ সরলা ও দয়াবতী। মহাপুরুষকে গর্ভে ধারণকালে মাতার সদ্গুণ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন—

সর্বজীবে দয়া ভেল শচীর অন্তরে।
আত্মজ্ঞানে দয়া করে—নাহি ভিন্ন পরে॥ [ম ২]

শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীরও একই অবস্থা। কোথা হইতে একটা সার্বজনীন প্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সংসারের কাজ করিতে করিতে তিনি মাঝে মাঝে দরিদ্র প্রতিবেশীদের গৃহে যাইয়া খবর লইতেন তাহাদের নিত্যপ্রয়োজনায় কোন বস্তুর অভাব আছে কিনা, এবং আছে জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ নিজের সংসার হইতে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং আহারে বসিবার পূর্বে পুনরায় তাহাদের গৃহে যাইয়া দেখিতেন তাহাদের সকলের আহার হইয়াছে কিনা, এবং কোন কারণে কাহারও খাবার জুটে নাই বুঝিতে পারিলে তাহাকে স্বগৃহে আনিয়া নিজের অন্ন ধরিয়া দিতেন।

২। আবির্ভাব-কাল

নবীন বসন্ত-সমাগমে যখন বসুন্ধরা গীতিমুখর ও সমুদয় প্রাণি-জগৎ নূতন প্রাণ-স্পন্দনে সঞ্জীবিত, সেই সুখদ সময়ে, মুখ্যচান্দ্র ফাল্গুনের

শুক্লপক্ষে বাঙ্গলার দুই মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন চৈতন্যের আবির্ভাব-তিথি পূর্ণিমা ; শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয়া।

৩। পত্নী-পরিজ্ঞান

একদা শ্রীবিশ্বম্ভর সদলবলে বনমালী আচার্যের গৃহে গমন করেন। আচার্যের সঙ্গে কথা কহিয়া ফিরিবার পথে দেখিলেন, বল্লভাচার্য-দুহিতা রুচিরাননা শ্রীমতী লক্ষ্মী সখীবেষ্টিতা হইয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছেন। দেখিয়াই তাঁহাকে স্বীয় ভাবী পত্নী বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

ততঃ কালেন কিয়তাচার্যস্য বনমালিনঃ।
জগাম পুর্যাং তং দ্রষ্টুং কৌতুকাৎ প্রণতস্য সঃ॥
আভাষ্য গচ্ছতাচার্যং হরিণা দদৃশে পথি।
বল্লভাচার্যদুহিতা সখীজনসমাবৃতা॥
স্নানার্থং জাহ্নবীতোয়ে গচ্ছন্তী রুচিরাননা।
দৃষ্ট্বা তাং তাদৃশীং জ্ঞাত্বা মনসা জন্মকারণম্॥
তস্যা জগাম নিলয়ং স্বমেব স্বজনৈঃ সহ। [মু ১।৯]

বহু অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া আত্মীয়স্বজনেরা যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন, তখন শ্রীগদাধর ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, 'জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুয্যের মেয়েটি কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখগে যা।'

৪। সাধু-অতিথি ও দরিদ্রের সেবা

নবদ্বীপে যারা যত ধর্মকর্ম করে।
ভোজ্যবস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর-স্বভাব।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥

দুঃখিতে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্নবস্ত্র কপর্দক দেন গৌরহরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥
কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশবিশ।
সভা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
ঘরে কিছু নাহি আই চিন্তে মনে মনে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে॥
চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেইক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি বৈসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥ [ভা ১।১০]

সন্ন্যাস গ্রহণের পরেও মহাপ্রভু সাধুগণের ও দরিদ্রের সেবা ত্যাগ করেন নাই। ভক্তগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিবার কালে তিনি সন্ন্যাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি॥
সভেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা।
প্রভুসঙ্গে সভে আসি প্রীতে করেন ভিক্ষা॥ [ভা ৩।১০]

রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র সপার্ষদ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইবার জন্য বিবিধ মহাপ্রসাদ প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়াছেন। সকলে আকণ্ঠ ভোজন করিবার পরেও প্রচুর প্রসাদ রহিয়া গিয়াছে। তখন—

প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে।
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করাইল ভোজনে॥
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি।
'হরি বোল' বলি তারে উপদেশ করি॥ [চ ২।১৪]

কামারপুকুরে পুরী যাইবার পথের উপর যে পান্থনিবাস ছিল, সময়ে সময়ে সাধুবৈরাগীরা তাহাতে বিশ্রামার্থ আশ্রয় লইতেন। কিশোর-বয়স্ক শ্রীগদাধর তাঁহাদের রন্ধনাদির জন্য কাঠ সংগ্রহ করিয়া ও পানীয় জল আনিয়া দিয়া সুখী হইতেন। কখনো বা তাঁহাদিগকে জননীপ্রদত্ত আহার্যও আনিয়া দিতেন।

ঠাকুরের সময়ে সাধুসন্ন্যাসীরা গঙ্গার ধার দিয়া হাঁটা পথ ধরিয়া গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে যাইতেন, এবং রাণী রাসমণির বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলিয়া কয়েক দিন বিশ্রাম করিতেন। তাঁহাদের জন্য সেখানে বরাবরই সদাব্রতের অনুষ্ঠান ছিল—যাহার যেমন ইচ্ছা ভাণ্ডার হইতে ডাল, চাল, আটা ইত্যাদি সিধা লইতেন। একসময়ে ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে মথুরানাথ সাধুদিগকে দিবার জন্য লোটা, কমণ্ডলু, কম্বল, আসন, এমনকি তাঁহারা যেসব নেশাভাঙ করেন—সিদ্ধি, গাঁজা, তান্ত্রিক সাধুদিগের জন্য 'কারণ' প্রভৃতি সকল জিনিসের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

একদা মথুরানাথ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি-মহলে ও গুরুগৃহে গমন করেন। রাণাঘাটের সন্নিকটে কোন স্থানে পল্লীবাসীদের দুর্দশা ও অভাব দেখিয়া ঠাকুর ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং নিমন্ত্রণ করিয়া

আনাইয়া মথুরানাথের দ্বারা তাহাদের প্রত্যেককে একমাথা তেল, একখানি নূতন কাপড় ও একদিনের ভোজন দান করাইয়াছিলেন।

আর একবার ৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হয়। "মথুরকে বলিলেন—'তুমি ত মার দেওয়ান। এদের একমাথা করে তেল ও একখানা করে কাপড় দাও, আর পেটটা ভরে একদিন খাইয়ে দাও।' মথুর বলিলেন—'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে দাওয়াতে গেলে টাকার অনটন হয়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?' সে কথা শুনে কে? 'বাবা'র তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন—'দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব, এদের কেউ নাই, এদের ছেড়ে যাব না।' এই বলিয়া বালকের ন্যায় গো ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন। মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'র কথামত সকল কার্য করিলেন।" [লী ১।৭]

৫। শাপে বর

নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর কীর্তন শুনিতে আসিলেন, কিন্তু দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকায় বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না।

ফিরি গেলা ঘর বিপ্র মনে দুঃখ পাঞা।
আরদিন প্রভুরে কহে গঙ্গায় লাগ পাঞা—॥
শাপিব তোমারে মুঞি পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ—॥
সংসারসুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস॥ [চ ১।১৭]

কোন কারণে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হলধারীর লোকে ভিতরে ভিতরে নিন্দা করিতেছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলেন। হলধারী তাহাতে হিতে বিপরীত বুঝিয়া রোষভরে কহিলেন, 'কনিষ্ঠ হয়ে তুই আমাকে অবজ্ঞা করলি? তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।'

"ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাত্রি ৮৷৯টা আন্দাজ সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়্‌সড়্‌ করিয়া মুখ দিয়া সত্যসত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন—'সিমপাতার রসের মত তার মিস্‌কাল রং—এত গাঢ় যে কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। ঠাকুর-বাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যেস্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও ঐরূপ হইতেছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল; কারণ জড়-সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না।'" [লী ৩।৮]

৬। তীর্থ-ভ্রমণ

(ক) কাশী—প্রয়াগ—বৃন্দাবন

মহাপ্রভু পদব্রজে পুরী হইতে ঝারিখণ্ডের পথে কাশী গমন করেন। সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে স্নিগ্ধমনা ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণের এক বিপ্র-ভৃত্য। ভট্টাচার্য ভিক্ষা করিয়া আনিয়া স্বয়ং পাক করিয়া মহাপ্রভুকে

ভোজন করাইতেন ; বিপ্র 'বস্ত্রাম্বুভাজন' বহিয়া চলিত। নির্জন স্নিগ্ধ বনপথে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে মহাপ্রভু নিজানন্দে বিভোর হইয়া চলিতেন।

কাশীতে তপন-মিশ্রের ঘরে দিন দশ থাকিয়া মহাপ্রভু মণিকর্ণিকায় স্নান এবং ৺বিশ্বেশ্বর ও ৺বিন্দুমাধব দর্শন করিলেন। তথা হইতে—

প্রয়াগে আসিয়া প্রভু কৈল বেণীস্নান।
মাধবে দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্যগান॥

প্রয়াগে তিনদিন থাকিয়া তিনি মথুরার পথে চলিলেন। মথুরামণ্ডলে প্রবেশ করিতেই তাঁহার ভাবপ্রেম শতধারে উছলিয়া উঠিল।

প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়—
এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়॥
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হৈয়া।
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া॥

মথুরায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য প্রেমিক বৃদ্ধ এক 'সনোড়িয়া' ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন হইল। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া যাবতীয় তীর্থ ও ব্রজমণ্ডলের সকল বন দর্শন করাইয়াছিলেন। আরিটগ্রামে মহাপ্রভু লুপ্ততীর্থ 'রাধাকুণ্ড' আবিষ্কার করেন।

প্রেমে গরগর মন রাত্রিদিবসে।
স্নান-ভিক্ষাদি নির্বাহ করেন অভ্যাসে॥ [চ ২।১৭]

বৃন্দাবন হইতে তিনি মাঘ মাসে প্রয়াগ হইয়া পুনরায় কাশীতে আসিলেন এবং তথায় দুইমাস থাকিয়া ঝারিখণ্ডের পথে পুরী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ঠাকুর ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া মথুরানাথ বহু আত্মীয়স্বজন সমভিব্যাহারে মাঘের মাঝামাঝি তীর্থযাত্রা করেন। ঐজন্য রেলকোম্পানীর নিকট

হইতে তিনখানি গাড়ী রিজার্ভ করা হয়। প্রথমতঃ ঝারিখণ্ডে ৺বৈদ্যনাথকে দর্শনাদি করিয়া তাঁহারা কয়েকদিন তথায় বাস করিলেন।

বৈদ্যনাথ হইতে তাঁহারা বরাবর কাশীতে আসিলেন। ঠাকুর ভাবচক্ষে 'স্বর্ণময়ী কাশী' দর্শন করিয়াছিলেন। হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রত্যহ ৺বিশ্বনাথজীউর মন্দিরে যাইতেন এবং যাইতে যাইতে পথেই ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। ৺কেদারনাথের মন্দিরেও তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

পাঁচসাত দিন কাশীতে থাকিবার পর ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগ যাইয়া পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিলেন। প্রয়াগ হইতে কাশীতে ফিরিয়া এবং একপক্ষ তথায় বাস করিয়া তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে অগ্রসর হইলেন।

বৃন্দাবনে ঠাকুর প্রায় সবদাই ভাবাবেশে থাকিতেন এবং সেইজন্য পালকি ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। বাঁকাবিহারী-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনি আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়াছিলেন এবং গিরিগোবর্ধন দেখিয়া ভাবাবেশে উহার শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় রাখাল বালকেরা যখন গরুর পাল লইয়া যমুনা পার হইতেছে, তাহাদের ভিতর পিঙ্গচূড় গোপালকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া প্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন।

একপক্ষ কাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া তাহারা পুনরায় কাশীতে আসিলেন এবং তথায় বৈশাখ পর্যন্ত থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলেন। বৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়া এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীরে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলেন, 'আজ থেকে এইস্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হল।'

(খ) গয়া—পুরী—দক্ষিণদেশ

গয়াধামের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ দুইজনেরই বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাপ্রভু গয়াতে পিতৃকৃত্য করিতে আসিয়া শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষিত ও ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়াছিলেন। গয়াতে ঠাকুরের পিতাকে গদাধর স্বপ্ন দিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন।

পুরীধামে মহাপ্রভু সুদীর্ঘকাল ঐশ্বরিক ভাবের আবেশে অতিবাহিত করিয়া অপ্রকট হন। ভগবৎপ্রেম বিতরণ করিতে করিতে, দর্শনাদি দানে অগণিত লোককে কৃতার্থ করিয়া, এবং জনপদের পর জনপদ পবিত্র করিয়া, মহাপ্রভু পদব্রজে সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করেন।

ঠাকুর তাঁহার শরীর-মনের উৎপত্তিস্থল গয়াধামে এবং শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটস্থল পুরীধামে যাইতে চাহেন নাই। তিনি বলিতেন, ঐ দুই স্থানে গেলে তাঁহার শরীর থাকিবে না—এমন গভীর সমাধিস্থ হইবেন যে, তাঁহার মন আর মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসিবে না। দক্ষিণভারতে তাঁহার যাওয়া হয় নাই।

যে সকল স্থানে ঠাকুর প্রকটকালে স্বয়ং যাইতে পারেন নাই, সেই সকল স্থানে তদীয় স্বরূপাভিন্না সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদাদেবীকে যাইতে বলিয়াছিলেন। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে শ্রীশ্রীমা একবার গয়াতে যাইয়া শ্রীগদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তিনবার পুরী গিয়া দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়াছিলেন, এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত গিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য পবিত্র ও বহু নরনারীকে দর্শন ও শ্রীচরণাশ্রয় দানে চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

৭। দাক্ষিণাত্য হইতে ভক্তিগ্রন্থ আনয়ন

প্রাচীনকাল হইতে দাক্ষিণাত্য ভক্তিধর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ-কালে পয়স্বিনী-তীরে 'ব্রহ্মসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়'

প্রাপ্ত হন, এবং কৃষ্ণবেণ্বা-তীরে 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' শ্রবণ করেন। ঐ দুই পুঁথির যত্নকৃত নকল মহারত্নজ্ঞানে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি উত্তর ভারতে প্রচার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের মানসপুত্র, স্বরূপে তদভিন্ন শ্রীরাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) দাক্ষিণাত্যে 'অষ্টোত্তরশত-নামরামায়ণ' গান শুনিয়া মুগ্ধ হন। তিনি ঐ নাম-রামায়ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়া বহুসংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও আগ্রহে ঐ নামরামায়ণ-গান কেবল বাঙ্গলায় নহে, সমগ্র উত্তর ভারতে প্রসার লাভ করিয়াছে।

৮। স্পর্শ দ্বারা ভাব-সংক্রমণ

"কোন ব্যক্তি ঠাকুরের মতের বিরোধী হইয়া তাঁহার সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিলে, অথবা কোন কারণে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া কেহ উপস্থিত হইলে, ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে তাহাদিগকে কৌশলে স্পর্শ করিতেন এবং ঐরূপ করিবার পরমুহূর্ত হইতে তাহারা তাঁহার কথা মানিয়া লইতে থাকিত।" [লী ৫।১২।২] ঐরূপ স্পর্শ দ্বারা ঠাকুর বিরুদ্ধভাবাপন্ন ব্যক্তির মনে নূতন ভাব সংক্রামিত করিতেন। ফলে ঐ ব্যক্তির অহঙ্কার দমিত হইত, বুদ্ধি নির্মল হইয়া তাঁহার কথাই সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিত, এবং ঐ ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করা ভবিষ্যতেও তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

মহাপ্রভুর প্রকটলীলায়ও অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান-রাজত্বে বিধর্মী কাজী সংকীর্তনের বিরোধী হইয়াছে, যদি তাহার মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন কিছু আনিতে পারা না যায়, তাহা হইলে আজ অত্যাচার বন্ধ করিলেও কাল আবার সে সংকীর্তনদলের উপর অত্যাচার করিবে। সম্ভবতঃ সেই কারণেই—

··মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া॥

তোমার মুখে কৃষ্ণনাম—এ বড় বিচিত্র।
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরম পবিত্র॥

... ...

.. একদান মাগি হে তোমায়।
সংকীর্তনবাদ [বাধা] যৈছে না হয় নদীয়ায়॥
কাজী কহে—মোর বংশে যত উপজীবে।
তাহাকে তালাক [শপথ] দিব কীর্তন না বাধিবে॥

[চ ১।১৭]

৯। ভক্তের জন্য ক্রন্দন ও মিলনে উল্লাস

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই ক্রন্দন করিতে করিতে, আকুল আহ্বান করিয়া, দূরস্থিত অন্তরঙ্গ ভক্তকে সমীপে আনয়ন করিয়াছেন এবং ঐরূপে মিলিত হইবার পরেও, কিছুদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইলে আবার তাঁহাদের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন।

.. ... গৌররায়।
'পুণ্ডরীক' নাম বলি কান্দে উচ্চ-রায়॥
'পুণ্ডরীক আরে মোর বাপ রে বন্ধু রে!
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপ রে!'

মহাপ্রভুর দুর্বার আকর্ষণে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চট্টগ্রাম হইতে নবদ্বীপে আসিলেন। যখন ভক্ত-ভগবানে মিলন হইল, তখন বিদ্যানিধিকে কোলে করিয়া—

'পুণ্ডরীক বাপ!' বলি কান্দেন ঈশ্বর।
'বাপ দেখিলাঙ আজি নয়নগোচর'॥

বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলেবর॥

.. ..

প্রভু বোলে—আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল বাসিয়ে আপনার॥
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে।
দেখিলাঙ প্রেমনিধি সাক্ষাতে নয়নে॥ [ভা ২।৭]

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আগমনের পূর্বে, ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইবার বাসনায় কতখানি ব্যাকুল হইয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন: "··দিবাভাগে···ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব।···কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব, ঐসকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।···যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত,··মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খঘণ্টা-রোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম।··কয়েকদিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।" [লী ৩।২১]

অন্তরঙ্গ ভক্তগণের ভিতর শ্রীনরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের জন্য ঠাকুর সবাপেক্ষা অধিক ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছিলেন। নিরন্তর ছয়

মাস সেই ব্যাকুলতার বিরাম হয় নাই। দেবালয়ের নির্জনস্থান ঝাউ-তলায় গিয়া 'ওরে তুই আয় রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া খানিকক্ষণ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া তবে তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিতেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথের বিরহে ঠাকুর যেমন ব্যাকুল হইতেন, মিলনে আবার তেমনি উল্লসিত হইয়া উঠিতেন। স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন: 'নিষ্কারণে একজন অপরকে যে এতদূর ভালবাসিতে পারে, ইহা আমাদিগের ইতিপূর্বে জ্ঞান ছিল না। নরেন্দ্রের প্রতি ঠাকুরের অদ্ভুত প্রেম দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, কালে সংসারে এমন দিন আসিবে যখন মানব মানবের মধ্যে ঈশ্বর-প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সত্যসত্যই ঐরূপ নিষ্কারণে ভালবাসিয়া কৃতকৃতার্থ হইবে।' [লী ৫।৫]

১০। আসন্ন বিপদে ভক্ত-রক্ষা

মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ-রায়ের পিতা ভবানন্দ-রায়ের পরিবারস্থ সকলেই তাঁহার ভক্ত। ভবানন্দের পঞ্চপুত্রের অন্যতম গোপীনাথ পট্টনায়ক উড়িষ্যা-রাজ্যের প্রদেশবিশেষের শাসনকর্তা ছিলেন। বিষয়ভোগে অমিতব্যয়ী হওয়ার জন্য তিনি সমুদয় রাজকর পরিশোধ করিতে অসমর্থ হন—দুই লক্ষ কাহন বাকি থাকিয়া যায়। একে রাজধনের অপব্যয়, তাহার উপর রাজপুত্রকে পরিহাস করিবার জন্য রাজপুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া গোপীনাথকে 'চাঙ্গে' চড়াইয়া নীচে খড়্গ পাতিলেন, এবং ভয় দেখাইয়া কার্যসিদ্ধি করিবার মানসে তাঁহার ভাই বাণীনাথ প্রভৃতিকেও বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। পরপর চারিবার লোক আসিয়া মহাপ্রভুকে সেই কথা জানাইল, স্বরূপাদি ভক্তগণও গোপীনাথের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গোপীনাথের অজিতেন্দ্রিয়তার জন্য তিরস্কার করিয়া, এবং স্বয়ং সন্ন্যাসী হইয়া কিছুতেই রাজদ্বারে প্রার্থী হইতে পারিবেন না—বলিয়া, মহাপ্রভু বাহিরে একান্ত উদাসীনতা

দেখাইলেন, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিতে ও পরোক্ষ প্রেরণায় ঘটনার মোড় ফিরিয়া গেল। রাজা গোপীনাথকে চাঙ্গ হইতে নামাইয়া আনিলেন, প্রাপ্য দুই লক্ষ কাহন ছাড়িয়া দিলেন, এবং পুনরায় তাঁহাকে পূর্বপদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন।

অন্য জমিদারের সহিত বিবাদে হঠকারী মথুরানাথের হুকুমে লাঠা-লাঠি ও মানুষ খুন হইয়া গিয়াছে। বিপন্ন মথুর ঠাকুরের কাছে সকল দোষ অকপটে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—'বাবা, রক্ষা কর।' ঠাকুর প্রথমে চটিয়া গিয়া ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, 'তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বলবি, রক্ষা কর—আমি কি করতে পারি? যা, নিজে বুঝগে যা—আমি কি জানি?' তারপর মথুরের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, যাঃ, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।' সেই বিপদ কাটিয়া গেল—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষিত ও বিশেষ সম্মানিত হইল!

১১। নীচকুল ভক্তের গৌরববর্ধন

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥ [চ ৩।৪]

মহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত এই উক্তি প্রমাণিত করিবার জন্যই যেন ভক্ত-শিরোমণি শ্রীহরিদাস মুসলমানকুলে অবতীর্ণ বা পালিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারা নামমাহাত্ম্য-প্রচার-রূপ শ্রেষ্ঠ কার্য সংসাধিত করিয়াছিলেন। স্মার্তাচারনিষ্ঠ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু হরিদাসের প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব স্থাপন করিবার জন্যই জাতি-ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে তাঁহাকে শ্রাদ্ধপাত্র ভোজন করাইয়াছিলেন। আর মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন:

এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ়॥

তোমারে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে।
নিরন্তর আছি আমি তোমার শরীরে॥ [ভা ৩।১০]

বৃদ্ধ হরিদাস দেহরক্ষার কাল সন্নিকট জানিয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন :

হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমলচরণ।
নয়নে দেখিমু তোমার চান্দবদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥

... ...

এই নীচদেহ মোর পড়ে তোমার আগে।
এই বাঞ্ছাসিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে॥

সকল ভক্তের সাক্ষাতে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু তাঁহার অন্তিম বাসনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিলেন এবং হরিদাসের মৃতশরীর কোলে তুলিয়া লইয়া প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। যখন সমুদ্রজলে হরিদাসকে স্নান করানো হইল, প্রভু কহে—'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল।' ভক্তগণ হরিদাসের পাদোদক পান করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীহস্তে তাঁহার দেহে বালুকা দিলেন এবং সিংহদ্বারে আসিয়া পসারিগণের নিকট আঁচল পাতিয়া প্রসাদান্ন ভিক্ষা মাগিলেন তাঁহার মহোৎসব করিবেন বলিয়া। ভক্তগণকে প্রসাদ পাইতে বসাইয়া মহাপ্রভু স্বয়ং পরিবেশন করিতে গেলেন এবং ভোজনান্তে হরিদাসের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে সখেদে কহিলেন :

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনু রত্নশূন্য হইলা মেদিনী॥ [চ ৩।১১]

কামারপুকুরের কামারকন্যা বালবিধবা 'ধনী' শ্রীগদাধরের ধাই-মা ও তাঁহাতে বাৎসল্যযুক্তা ছিলেন। শ্রীগদাধর তাঁহার হস্তে আহার্য গ্রহণ করিতেন, এবং তাঁহার প্রার্থনায়, উপনয়নকালে তাঁহাকে ভিক্ষামাতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই বংশে ব্রাহ্মণেতরজাতীয়া নারীকে ভিক্ষামাতা করার রীতি ছিল না, এবং কোন কালে শূদ্রদত্ত দানও গ্রাহ্য হইত না। সকলেই ধনীকে ভিক্ষামাতা করার কথায় আপত্তি জানাইলেন, কিন্তু শ্রীগদাধর দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন :

> কখন লব না ভিক্ষা অপরের হাতে।
> না হয় না হবে পৈতা ক্ষতি নাই তাতে॥ [পুঁ]

এবং জেদের বশীভূত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া দরজায় খিল দিলেন। এই ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ভক্তপ্রীতিই অবশেষে জয়যুক্ত হইল—ধনী তাঁহার মাতৃসম্বোধনে ধন্য হইয়া জাতি-কুল পবিত্র করিলেন।

ঠাকুরের প্রকটলীলায় এইজাতীয় ঘটনা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কৈবর্তজাতীয়া রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে পৌরোহিত্য গ্রহণ ও তথায় বহুবৎসর বাস করিয়া ঠাকুর উহাকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছেন—রাসমণির জন্মকর্ম সার্থক হইয়াছে। ঐ রাণীরই জামাতা মথুরানাথ একাদিক্রমে চৌদ্দ বৎসর একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, এবং সুদীর্ঘকাল সপরিবারে তাঁহাকে লইয়া আনন্দ—তাঁহার সহিত একত্র আহারবিহার, ভ্রমণ, এমনকি শয়ন পর্যন্ত—করিয়াছিলেন! উচ্চকুলোদ্ভব কোন ভক্তই এরূপ উচ্চ সৌভাগ্যের অধিকারী হন নাই। মথুরের অন্তিমকালে ঠাকুর দুইতিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হন এবং জ্যোতির্ময়-পথে দিব্যশরীরে ভক্তের পাশে উপস্থিত হইয়া বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাঁহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইয়া দেন।

১২। মাধুর্য দ্বারা আকর্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন :

হসিতৈরপি কাংশ্চিদঞ্জসা
বচনেনাপি তথেতরান্ প্রভুঃ।
কৃপয়া চ কয়াচনেতরা
নকরোদাত্তমনোরথোৎসুকান্॥ ১৮।৩৮

প্রভু কাহাকেও হাস্য দ্বারা, কাহাকেও বাক্য দ্বারা, কাহাকেও বা কৃপাবিশেষ দ্বারা ত্বরায় সিদ্ধকাম ও আকৃষ্ট করিতেন।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' শীর্ষক কবিতায় নটকবি গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :

নিরৈশ্বর্য আসিয়াছ মাধুর্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য অধরে :
পাছে নর নাহি আসে ডরে,
দীনবেশে ডাক সকাতরে :
হরিবারে মনপ্রাণ কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।

১৩। ভাবাবেশে নৃত্য

প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীনয়নানন্দ লিখিয়াছেন :

কি না সে সুখের সরোবরে।
প্রেমের তরঙ্গ উথলিয়া পড়ে ধারে॥

নাচত পহুঁ বিশ্বম্ভরে।
প্রেমভরে পদ ধরে, ধরণী না ধরে ॥
বয়ান কনয়া চাঁদছাদে।
কত সুধা বরিখয়ে, থির নাহি বাঁধে।
রাজহংস প্রিয় সহচরে।
কেহ ভেল মধুকর কেহ বা চকোরে ॥
নব নব নটনীলহরী।
প্রেম-লছিমী নাচে নদীয়ানগরী ॥ [ত ৪।২।৩১]

ভাবভরে হেলন ভাবভরে দোলন
প্রতি অঙ্গে ভাব বিথারি।
রসভরে গরগর চলই খলই রে
গোবিন্দদাস বলিহারি ॥ [ত ৪।২।২৭]

পানিহাটীর মহোৎসবে ঠাকুরের নৃত্য দর্শন করিয়া স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন: "ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখন অগ্রসর হইতে এবং কখন পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন 'সুখময় সায়রে' মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐভাব পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্যমিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। স্ত্রীপুরুষের হাবভাবময় মনোমুগ্ধকারী নৃত্য অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু দিব্য ভাবাবেশে আত্মহারা হইয়া তাণ্ডবনৃত্য করিবার কালে ঠাকুরের দেহে যেরূপ রুদ্রমধুর সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিত, তাহার আংশিক ছায়াপাতও ঐসকলে আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। প্রবল ভাবোল্লাসে উদ্বেলিত হইয়া তাঁহার দেহ যখন হেলিতে দুলিতে

ছুটিতে থাকিত তখন ভ্রম হইত, উহা বুঝি কঠিন জড় উপাদানে নির্মিত নহে, বুঝি আনন্দসাগরে উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে সম্মুখস্থ সকল পদার্থকে ভাসাইয়া অগ্রসর হইতেছে—এখনই আবার গলিয়া তরল হইয়া উহার ঐ আকার লোকদৃষ্টির অগোচর হইবে।" [লী ৫।১০]

১৪। ভাবাবেশে আহার

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক আহার করিতে পারিতেন; শেষাশেষি মহাপ্রভু আহার অত্যন্ত কমাইয়া দিয়াছিলেন, ঠাকুরেরও আহার কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে-কোন অবস্থায় ঐশ্বরিক ভাবাবেশে তাঁহারা দুইজনেই প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছেন, অথচ তজ্জন্য কখনো অসুখ হয় নাই।

ঐশ্বরিক আবেশে মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণু-খট্টায় আসীন হইয়া ভক্তপ্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করিতেছেন :

করে করে প্রভুরে যোগায় সব-দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥
দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায়।
আর কি আছয়ে আন—বোলয়ে সদায় ॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করা-মিশ্রিত।
মুদগ নারিকেল-জল শস্যের সহিত ॥
কদলক, চিপিটক, ভর্জিত-তণ্ডুল।
আর বার আন—বোলে, খাইয়া বহুল ॥
... ...
কর্পূর তাম্বূল আছে শুনহ গোসাঞি।
প্রভু বোলে—তাই দেহ কিছু চিন্তা নাই ॥ [ভা ২।৮]

গৌড়ের ভক্তগণ পুরী আসিয়াছেন। তাঁহারা পৈড়, নাড়ু, পিঠাপানা ইত্যাদি উত্তম প্রসাদদ্রব্য আনিয়া মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দের হাতে দিয়া অনুরোধ করেন, 'ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি।' কিন্তু মহাপ্রভুকে সেই দ্রব্য দিতে গেলেই বলেন, 'ধরি রাখ।' ধরিতে ধরিতে ঘরের এককোণ ভরিয়া গেল। গোবিন্দ সদৈন্যে নিবেদন করিলেন :

আচার্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥
তুমি সে না খাও, তারা পুছে বারবার।
কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার ?
প্রভু কহে—আদিবশ্যা দুঃখ কাহে মানে ?
কে কি দিয়াছে, সব আনহ এখানে॥

... ...

শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে ? বলি গোবিন্দে পুছিল॥ [চ ৩।১০]

ঠাকুর কামারপুকুরে আছেন। পেটের অসুখ হওয়ায় রাত্রে দুধবার্লি খাইয়া শয়ন করিয়াছেন। খানিক পরে ভাবাবেশে টলিতে টলিতে ঘরের বাহিরে আসিলেন এবং রামলালের মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তোমরা সব শুলে যে ? আমাকে কিছু খেতে না দিয়ে শুলে যে ?'

রামলালের মা—ওমা, সে কি গো ? তুমি যে এই খেলে !

ঠাকুর—কৈ খেলুম ? আমি ত এই দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি—কৈ খাওয়ালে ?

রামলালের মা থালায় করিয়া মুড়ি আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে ধরিলেন।

তাহাতে বালকের ন্যায় রাগ করিয়া ঠাকুর পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'শুধ্ মুড়ি আমি খাব না।' অগত্যা রামলাল সেই গভীর রাত্রে দোকানে যাইয়া মিঠাই কিনিয়া আনিলেন। একসের মিঠাই ও সহজ লোকে যত খাইতে পারে তদপেক্ষা অধিক মুড়ি থালায় ঢালিয়া দেওয়া হইলে ঠাকুর সানন্দে খাইতে বসিলেন এবং দেখিতে দেখিতে সমস্তই খাইয়া ফেলিলেন। [লী ২।১]

এইজাতীয় ঘটনা প্রায়ই ঘটিত।

১৫। সূক্ষ্মদেহে কীর্তনানন্দ উপভোগ

পানিহাটী-গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যখন সপার্ষদ বিরাজ করিতেছিলেন, তখন একদিন ভক্তেরা সকলেই অতি-অপ্রত্যাশিতভাবে দমনক-পুষ্পের সুগন্ধ অনুভব করিতে থাকেন। দিব্যদৃষ্টি নিত্যানন্দপ্রভু কহিলেন:

... শুন সভে পরম রহস্য।
তোমরা সকল ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্যগোসাঞি আজি শুনিতে কীর্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য দমনক-গন্ধে।
চতুর্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সভাকার নৃত্য কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইসে প্রভু নীলাচল হৈতে॥ [ভা ৩।৫]

স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন: এক সময়ে তিনি দূরস্থ দেবদেবীর মূর্তি দর্শন অথবা কীর্তনাদি শ্রবণ করিতে অভিলাষী

হইলে, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট এক সন্ন্যাসী যুবক তাঁহার শরীর হইতে বাহির হইয়া জ্যোতির্ময়পথে সেই সকল স্থানে যাইতেন এবং ইচ্ছামত কিছুকাল আনন্দ ভোগ করিয়া পুনরায় ঐপথে আসিয়া তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেন।

১৬। পুনরবতার-প্রসঙ্গ

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিবেন জানিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তেরা বিষণ্ণ হইয়াছেন। তিনি এই বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতেছেন :

… তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি-সব যথা, তথা আমি সর্বক্ষণ॥
তোমা সভার জ্ঞান, আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া॥
সর্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোনক্ষণে॥
সর্বকাল তোমরা সকল মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে যেন তুমি-সব আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সঙ্কীর্তন-সুখ-রঙ্গে॥
এইমত আছে আর দুই অবতার।
কীর্তন-আনন্দ রূপ হইব আমার॥
তাহাতেও তুমি-সব এইমত রঙ্গে।
কীর্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে॥ [ভা ২।২৬]

ঠাকুর বলিয়াছেন : 'আর একবার আসতে হবে।' [ক ৪।৮।২]
[কলিকাতার] 'বায়ুকোণে আর একবার (আমার) দেহ হবে।'

[ক ৪।২৪।২] তখন অনেক লোক মুক্ত হবে; আর যারা না হবে, মুক্তির জন্যে তাদের দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।' [লী ৩।২১]

ঠাকুরের বিভিন্ন সময়ের উক্তি আলোচনা করিয়া ইহাই বুঝা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে আগমন সম্বন্ধেই তিনি 'আর একবার আসতে হবে' বলিয়াছেন। এই আগমনও যে বাঙ্গলা দেশেই ঘটিবে তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীমতী সারদাদেবীর উক্তি হইতে জানা যায়।

১৭। দয়া

একদিন শ্রীমন্দিরে দয়াল ঠাকুর।
দুনয়নে বারিধারা কাঁদেন বসিয়া।
এই বলি তাপে তপ্ত জীবের লাগিয়া — ॥
কি হইল ওমা কালী, দেখ মম গায়।
সতত অস্থির, বল মাত্র নাহি তায় ॥
চলিতে অসক্ত পদ—আদতে না চলে।
কোথা পাই, চাই যান, কোথা যেতে হলে ॥
কেবা দিবে গাড়ীভাড়া নিতাই আমায়।
জীবের কল্যাণে বড় পড়িলাম দায় ॥
নদীয়ায় গৌরচন্দ্র বীর বলবান।
দ্বারে দ্বারে ফিরে কৈলা জীবের কল্যাণ ॥
ব্যয়কুণ্ঠ জীবকুল আসক্ত কাঞ্চনে।
কড়া-বায়ে ঘোড়া যায় এই ভাবে মনে ॥ [পুঁ]

একাদশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের অভ্যুদয়ে গৌর-ভক্ত-জগতে আলোড়ন

১। রঙ্গমঞ্চে চৈতন্যলীলা ঃ

ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা

শক্তিমান নটকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটকাকারে শ্রীচৈতন্যলীলা গ্রথিত করিয়াছেন। সুদক্ষ শিল্পীর রচনা তদনুরূপ প্রযোজনা ও অভিনয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে যেন ভক্তিপ্রেমের বান ডাকিয়াছে।

মুগ্ধকর গীতগুলি ভক্তিপ্রেমে ভরা।
চিত্তহর অভিনয়ে শ্রোতা মাতোয়ারা ॥
মঞ্চমধ্যে অভিনয় অবিকল হয়।
অভিনয়ে অভিনয় না হয় প্রত্যয় ॥
দেখিতে চৈতন্যলীলা ব্যগ্র এত লোকে।
পেটে না খাইয়া কড়ি দেখিবারে রাখে ॥

... .

দূরদূরাঞ্চলে কথা এত রাষ্ট্র হয়।
অনেকে দেখিতে আসে অর্থ করি ব্যয় ॥
গোউর-ভকতে উঠে আনন্দ অপার।
শুনিয়া চৈতন্যগীত মুখে যার তার ॥
ব্রজ-বিদ্যারত্ন নামে ভক্ত একজন।
নবদ্বীপে বাস, জেতে গোস্বামী ব্রাহ্মণ ॥

গোরা-ধ্যান গোরা-জ্ঞান গোরা-পদে মতি ।
গোউর-চরণ সেবে ঘরে দিবারাতি ॥

মূরতি রাখিয়া ঘরে অতি ভক্তি-ভরে ।
মঞ্চে লীলা অভিনয় শুনিলেন পরে ॥

কহিলা মথুরানাথে আপন নন্দনে ।
গোপ্যকথা, সেইহেতু ডাকিয়া গোপনে— ॥

সুখের বারতা কিবা পাই শুনিবারে ।
গৌরলীলা অভিনয় মঞ্চের ভিতরে ॥

নিশ্চয় বুঝিবে মনে, সন্দ নাহি তায় ।
পুনরায় গৌরচন্দ্র উদয় ধরায় ॥

সঙ্গে লয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ যতেক তাহার ।
প্রচারিতে ভক্তিমূল লীলা আপনার ॥

বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত আমি যাইতে অক্ষম ।
জানিতে যথার্থ তত্ত্ব করহ গমন ॥

... ...

জনক যেমন, তাঁর তেমতি নন্দন ।
সহরে আসিয়া করে গোউরান্বেষণ ॥

... ...

অভিনয়ে শুনিয়া ভকতিমাখা গীত ।
ভক্তিমান ব্রাহ্মণ-সন্তান বিমোহিত ॥

উথলে আনন্দে হিয়া পুলক অপার ।
দ্রুত ধায় দেখিবারে কেবা নাট্যকার ॥

আত্মহারা—গিরিশে করিয়া দরশন।
বাসনা—ধূলায় লুটে ধরিয়া চরণ॥

... ...

আশীষিল হাত তুলি গিরিশে প্রচুর—।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর করুন গোউর॥
কায়মনোবাক্যে আমি করি আশীর্বাদ।
পাইবে পরমগুরু, পূর্ণ হবে সাধ॥ [পুঁ]

২। ঠাকুরের চৈতন্যাসন গ্রহণ ঃ

ভগবানদাস বাবাজীর মন্তব্য ও উহার পরিণতি

কলুটোলার হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও একপাশে বসিয়া পাঠ শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

সম্মুখেই ভগবান শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশে রচিত আসন; তাহা যথাবিধি পূজিত ও পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়াছে। পাঠক ভক্তিভাবে পাঠ করিতেছেন, যেন মহাপ্রভুকেই শুনাইতেছেন; শ্রোতারাও অনুরূপ চিন্তায় উল্লসিত হইতেছে।

পাঠ শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আত্মহারা হইলেন এবং সহসা ছুটিয়া গিয়া সেই আসনের উপর দাঁড়াইয়াই গভীর সমাধিতে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার জ্যোতির্ময় মুখে অদৃষ্টপূর্ব প্রেমপূর্ণ হাসি, আর ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হস্তে অঙ্গুলিনির্দেশ—যেমন শ্রীগৌরাঙ্গের পটে দেখা যায়।

পাঠক পাঠ ভুলিয়া গেলেন। বিশিষ্ট ভক্তেরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকেই দর্শন করিতেছি ভাবিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন, আর সাধারণ লোকেরা বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিলেও একটা অব্যক্ত

ভয়বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ঠাকুরের ভাবপ্রবাহ তখন সকলকেই এক অনির্বচনীয় আনন্দে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে!

সেই ভাবের প্রেরণায় সকলে উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া নামসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইল; তিনি কীর্তনের দলে মিশিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহাতে কীর্তনীয়াদের উৎসাহ ও মত্ততা শতগুণে বাড়িয়া গেল। ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই সেদিনকার আনন্দ উপভোগ করিলেন—বুঝি বা গোলোকের ছবি ধরায় প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইলেন।

ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন। যে দিব্য ভাবপ্রবাহ সকলের মনকে উচ্চগ্রামে তুলিয়া ধরিয়াছিল, ক্রমে তাহাতে ভাটা পড়িল। উত্তেজনার পরেই আসিল অবসাদ। সেই অবসাদের মুহূর্তে হরিসভার সভ্যেরা ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যাসন অধিকার করাটা উচিত হইয়াছে কিনা, বিচার করিতে বসিলেন। ঘোরতর দ্বন্দ্ব ও বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। একদল তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন, অন্যদল করিলেন না। ফলে কোন মীমাংসাই হইল না।

কথা কানে হাটে। বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র উহা প্রচারিত হইতে বিলম্ব হইল না। কালনার ভগবানদাস বাবাজীও সেই কথা শুনিলেন। শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে কত কটুকথা কহিলেন, এমনকি, তাঁহাকে ভণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিতেও ছাড়িলেন না।

ঘটনার দিন কয়েক পরেই ঠাকুর হৃদয় ও মথুরানাথকে সঙ্গে লইয়া কালনায় উপস্থিত হইলেন। প্রত্যুষে নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই মথুরানাথ থাকিবার স্থান ও আহারাদির বন্দোবস্তে ব্যস্ত হইলেন এবং ঠাকুর হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া শহর দেখিতে বাহির হইলেন। ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমের সন্নিকটে আসিয়া ঠাকুর হৃদয়কে কহিলেন, 'তুই আগে আগে যা।' তারপর নিজের আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া হৃদয়ের পেছনে পেছনে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

সেই সময়ে বাবাজীর আসরে কোন বৈষ্ণব সাধুর কথা হইতেছিল। সে কোন নিন্দিত কাজ করিয়াছিল, আর বাবাজী তাহার কণ্ঠী কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সম্প্রদায় হইতে তাড়াইয়া দিবেন বলিতেছিলেন। সেইকথা শুনিতে শুনিতে আসিয়া, বাবাজীকে প্রণাম করিয়া ঠাকুর দীনহীনভাবে একপাশে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, 'আমার মামা ঈশ্বরের নামে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েন —অনেকদিন থেকেই এই অবস্থা—আপনাকে দেখতে এসেচেন।'

কথার অবসরে বাবাজীকে মালা ফিরাইতে দেখিয়া হৃদয় বলিলেন, 'আপনি এখনো মালা রেখেচেন কেন, আপনি তো সিদ্ধ হয়েচেন?' উত্তরে বাবাজী প্রথমতঃ দীনতা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাহার পরেই বলিলেন, 'নিজের প্রয়োজন না থাকলেও লোকশিক্ষার জন্য ওসব রাখা দরকার, নতুবা আমার দেখাদেখি লোক ভ্রষ্টাচার হবে।'

ভগবানদাসের মুখে বারবার অহঙ্কারসূচক কথা শুনিয়া ঠাকুর কেমন এক ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বাবাজীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'কী? তুমি এখনো এত অহঙ্কার রাখ? তুমি লোকশিক্ষা দেবে? তুমি তাড়াবে? তুমি ত্যাগ ও গ্রহণ করবে? তুমি লোকশিক্ষা দেবার কে? যাঁর জগৎ তিনি না শেখালে তুমি শেখাবে?' বলিতে বলিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সেই আপাদমস্তক আবরণ তখন আর নাই, কটি হইতে কাপড়ও খুলিয়া পড়িয়াছে। ঠাকুর একেবারে দিগম্বর, আর তাঁহার মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দিব্য তেজে ভাস্বর!

সেই ভাবোজ্জ্বল দিব্যদেহে সিদ্ধ বাবাজী কী দেখিতে পাইলেন, কে জানে! সেই শক্তিপূর্ণ কথা তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি আরও খুলিয়া দিল, তিনি বিনীত ও নম্র হইলেন। তারপরে যখন বাবাজী শুনিলেন, ইনিই দক্ষিণেশ্বরের সেই পরমহংস যিনি কলুটোলার হরিসভায় শ্রীচৈতন্যাসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষোভ ও পরিতাপের সীমা রহিল না। পূর্বকৃত অপরাধের জন্য ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া তিনি পুনঃপুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

মথুরানাথের কাছে ফিরিয়া ঠাকুর বাবাজীর উচ্চাবস্থার অনেক প্রশংসা করিলেন। মথুরানাথ বাবাজীকে দর্শন করিতে গেলেন, এবং আশ্রমস্থ ৺রাধাকান্তের সেবা ও একদিনের মহোৎসবের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে

শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবে সাধনা

স্বীয় সাধনকথা-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ

'কখনও মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসতো। আবার কখন লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো।'

'যখন লীলায় মন নেমে আসতো, কখনো সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হতো।···কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐরূপ সর্বদা দর্শন হতো। আবার কখন গৌরাঙ্গের ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন—পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গৌরাঙ্গের রূপ দর্শন হতো।'

[ক ৩।১৪।১]

নবদ্বীপ-দর্শন

ঠাকুরের ভক্তগণের ভিতর কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্বে সন্দিহান ছিলেন। সন্দেহটা ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করিতেই তিনি বলিলেন ঃ

"আমারও তখন তখন ঐরকম মনে হত রে, ভাবতুম পুরাণ ভাগবত কোথাও কোন নামগন্ধ নেই—চৈতন্য আবার অবতার! ন্যাড়া নেড়ীরা টেনে বুনে একটা বানিয়েচে আর কি! কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত না।[১] মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত

১ পাশবদ্ধ জীবকে শিবত্ব লাভের পথ দেখাইবার জন্য জীবের অপূর্ণতা নিজেতে আরোপ করিয়া অবতারপুরুষের সাধনভজন ; আর সন্দেহাকুল জীবের প্রতীতি জন্মাইবার জন্য সেই সন্দেহ নিজেতে আরোপ করিয়া পুনরায় উহার নিরসন। 'জৈব ভাবে আচরণ জীবের উদ্ধারে।' [পুঁ]

সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ (দেবভাবের) দেখবার জন্য এখানে, ওখানে, বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম— কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না! সব জায়গাতেই এক এক কাটের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েচে দেখলুম! দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল, ভাবলুম, কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠ্‌চি এমন সময় দেখতে পেলুম! অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখন দেখি নি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসচে! অমনি 'ঐ এলো রে, এলো রে' বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম! জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল, ধরে ফেল্লে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে—বাস্তবিকই অবতার, ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ!" [লী ২।৩]

শ্রীগৌরাঙ্গের নগরকীর্তন দর্শন ঃ

শিহড় ও শ্যামবাজারে সংকীর্তনরঙ্গ

ঠাকুরের বাসনা হইল, শ্রীগৌরাঙ্গের নগর-সংকীর্তন দেখিবেন। দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিলেন ঃ পঞ্চবটীর দিক হইতে এক বিরাট সংকীর্তনতরঙ্গ বকুলতলার দিকে, অর্থাৎ তাঁহার নিজের দিকে আসিতেছে, তথা হইতে বাঁকিয়া কালীবাটীর প্রধান ফটকের দিকে যাইতেছে এবং বৃক্ষসমূহের আড়ালে অন্তর্হিত হইতেছে। জনতার মধ্যভাগে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখা যাইতেছে। মহাপ্রভু হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ধীরপদে চলিয়াছেন। তাঁহার প্রেমানন্দ বিচ্ছুরিত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলকে অভিভূত করিতেছে—উল্লাসের আধিক্যে কেহ অবশ হইয়াছে, কেহ বা উদ্দাম নৃত্য করিতেছে। এত লোক হইয়াছে যে, মনে হইতেছে যেন জনসমুদ্র—লোকের আর অন্ত নাই। ঐ সংকীর্তনদলের ভিতর দুইজনের মুখ ঠাকুরের চিত্তপটে অঙ্কিত হইয়া যায়, এবং কিছুকাল পরে তাঁহাদিগকে নিজভক্তরূপে আসিতে দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, জন্মান্তরে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ ছিলেন।[২]

মহাপ্রভুর নগরসংকীর্তন দেখিবার অল্পকাল পরে ঠাকুর দেশে আসিলেন। শিহড়ে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়ীতে ঠাকুর আছেন, দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ—নবনটবরবেশ, 'কালাপেড়ে কাপড় পরা'। [ক ৪।১।২]

ঠাকুরের সংসর্গে শিহড়বাসীরা ক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত ও সংকীর্তনে মত্ত হইয়া উঠিল। আগে তাহারা—

জানিত না গোউর নিতাই কোন্ জন্।
কার ছেলে কোথা বাড়ী কোথায় জনম ॥
... ...
দেখিলে চৈতন্যভক্ত উচ্চ উপহাস।
করিত সকলে তাড়া হাতে লাঠি বাঁশ ॥
গোউর নিতাই বলি যেথা সংকীর্তন।
কেড়ে ভেঙ্গে দিত খোল গ্রামবাসিগণ ॥

২ কথামৃত-লেখক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'এই চক্ষে—ভাবে নয়—দেখলাম, চৈতন্যদেবের সংকীর্তন বটতলা থেকে বকুলতলার দিকে যাচ্চে। তাতে বলরামকে দেখলাম, আর যেন তোমায় দেখলাম।' [ক ৪।৩১।২]

মাঝে মাঝে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তাহারা গ্রামের পথে পথে সংকীর্তন করিয়া বেড়াইত, শিহড়ের ৺শান্তিনাথ-শিবমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহুক্ষণ ধরিয়া কীর্তন চলিত। একদিন সকলে মত্ত হইয়া গান ধরিল :

সংকীর্তনে আমার গোরা নাচে।
দেখো রে বাপ নরহরি, থেকো গৌরের কাছে।
সোনার বরণ গৌর আমার ধূলায় পড়ে পাছে ॥

গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর মহাভাবে আবিষ্ট হইলেন ও লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ দেহ আরও উজ্জ্বল হইল, যেন হেমকান্তি ফাটিয়া পড়িতেছে!

বারে বারে এক-ধুয়া যত ভক্ত গায়।
তাহাতে হইলা প্রভু উন্মত্তের প্রায় ॥
নাহি আর বাহ্যজ্ঞান কিভাবে কে জানে।
লুটালুটি যান গোটা মন্দির-প্রাঙ্গণে ॥
পাষাণে প্রাঙ্গণ বাঁধা সুকর্কশ তায়।
সুকোমল প্রভু-অঙ্গ কত ছোড়ে যায় ॥

সকলে তাঁহাকে ধরিয়া নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কিরূপ ভাবাবস্থায় কোন্ মন্ত্র শুনাইলে ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হন হৃদয় জানিতেন। তিনি কাণে মন্ত্র শুনাইতে লাগিলেন ও ক্রমে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। [পুঁ]

শিহড়ের নিকটে মেমানপুর গ্রাম। মেমানপুরে বছরে দ্বাদশ উৎসব হইয়া থাকে। এবারকার উৎসবে প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া গোপালের কীর্তন হইতেছে, শিহড়ে খবর আসিল। শিহড়বাসীরা ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া গিয়া সেই কীর্তনানন্দ উপভোগ করিতে ব্যগ্র হইল।

সুস্থির কমল প্রভু ভাবাবেশহীনে।
আন্দোলিত ভাবাবেশে যেমন পবনে॥
আন্দোলনে বহুগুণে সৌরভ বিস্তার।
তাই লোকজনে পায় আনন্দ অপার॥

... ...

সেই হেতু প্রভুদেবে শিয়ড়িয়া জনা।
যাইতে মেমানপুরে করিল প্রার্থনা।
শুনি কথা প্রভুদেব দিলেন উত্তর।
হৃদুরে পাঠাও আগে জানিতে খবর॥

হৃদয়ের মুখে বার্তা পাইয়া গোপাল সেদিনকার মত কীর্তন সাঙ্গ করিলেন; এবং ঠাকুরকে দর্শন করিবার ও কীর্তন শুনাইবার মানসে সদলবলে সহ শিহড় রওনা হইলেন। অর্ধক্রোশ দূরে থাকিতে কীর্তনীয়ারা একবার খোল ও রণশিঙ্গা বাজাইল। দূরাগত সেই শব্দ শিহড়বাসীরা শুনিতে পাইল না, কিন্তু ঠাকুর শুনিতে পাইয়া ভাবাবিষ্ট হইলেন ও বলিলেন, 'গোপালকে সঙ্গে নিয়ে হৃদু আসচে।' রাত যখন প্রায় ছয় দণ্ড গত হইয়াছে, কীর্তনীয়া গোপাল আসিয়া ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর সমাধিস্থ।

ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল। গোপাল মধুরকণ্ঠে কীর্তন আরম্ভ করিলেন:

ভুবনসুন্দর গোউর নদেয় কে আনিল রে।
এমন রূপ বিধি বুঝি দেখে নাই,
গড়েছে বটে, কিন্তু বিধি দেখে নাই,
দেখলে ছেড়ে দিত নাই।

কীর্তন চলিয়াছে। আখরের ছলে ঠাকুর গাহিলেন ঃ

গোপাল রে, তুই কি বল্লি রে!
গোরারূপ বিধির গড়া নয়,
স্বয়ং স্বপ্রকাশ রূপ—বিধির গড়া নয়।
এইরূপে গোরারূপ আখরে আখরে।
গাইতে লাগিলা প্রভু সুমধুর স্বরে।

... ...

নহে সায়, না ফুরায় রূপের বর্ণন।
ক্রমে রাতি ঊর্ধ্বগতি, চলিছে কীর্তন॥

....

দণ্ডবৎ নিপতিত শ্রীপদে গোপাল।
হৃদয় জানায় ডেকে ভোজনের কাল॥
অদ্যাপি শিয়ড়ে এই কীর্তনের কথা।
দেখা শুনা যাহাদের, মনে আছে গাঁথা॥
কি দেখেছে কি শুনেছে প্রভুর ভিতরে।
সঠিক চেহারা কেহ দিতে নাহি পারে॥
স্মরণে অপার সুখ, সমস্বরে কয়—।
আমরি! আমরি! কথা কহিবার নয়॥ [পুঁ]

শ্যামবাজারের শ্রীনটবর গোস্বামী ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তিনি আমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন ও তাঁহার সেবায় সস্ত্রীক নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরকে কীর্তনানন্দ দান করিবার জন্য তিনি রামজীবনপুরের প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ধনঞ্জয় দে ও কৃষ্ণগঞ্জের বিখ্যাত খোলবাদক রাইচরণ দাসকে আনাইলেন। রাইচরণের খোলবাজনা

আরম্ভ হইলেই ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন। শ্যামবাজারে নর-নারীর আনন্দের হাট বসিল।

ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছেন ঃ

"ওদেশে যখন হৃদের বাড়ীতে ছিলাম, তখন শ্যামবাজারে নিয়ে গেল। বুঝলাম গৌরাঙ্গভক্ত। গাঁয়ে ঢোকবার আগে দেখিয়ে দিলে। দেখলাম গৌরাঙ্গ! এমনি আকর্ষণ—সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্তন আর নৃত্য। পাঁচীলে লোক! গাছে লোক!

"নটবর গোস্বামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেখানে রাতদিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে এক তাঁতীর ঘরে সকালে গিয়ে বসতাম। সেখানে আবার দেখি, খানিক পরে সব গিয়েচে! সব খোল করতাল নিয়ে গেছে!—আবার 'তাকুটী! তাকুটী!' করচে। খাওয়াদাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো।

"রব উঠে গেল—সাতবার মরে, সাতবার বাঁচে, এমন এক লোক এসেচে! পাছে আমার সর্দিগরমি হয়, হৃদে মাঠে টেনে নিয়ে যেতো; সেখানে আবার পিঁপড়ের সার! আবার খোল করতাল—তাকুটী! তাকুটী! হৃদে বকলে, আর বল্লে, 'আমরা কি কখনও কীর্তন শুনি নাই?'...

"দূর গাঁ থেকে লোক এসে জমা হতো। তারা রাত্রে থাকতো।...

"আকর্ষণ কাকে বলে, ঐখানেই বুঝলাম। হরিলীলায় যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্‌কি লেগে যায়!" [ক ৪।২০।২]

গৌরীমাকে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলারঙ্গ প্রদর্শন

ভক্তিমতী গৌরীমার (গুরুদত্ত নাম 'গৌরদাসী') অন্তরে সাধ হইল, শ্রীগৌরাঙ্গ নদীয়ানগরে ভক্তদের সঙ্গে যেরূপ লীলারঙ্গ করিতেন তাহা দেখিবেন।

রবিবার, নবীন প্রবীণ বহুভক্ত দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুরকে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করাইবার মানসে গৌরীমা আজ রন্ধনকার্যে ব্যাপৃতা। খেচরান্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন পরিপাটিরূপে রান্না হইয়াছে, এটি ওটি রান্না করিতে বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া পড়িয়াছে। গৌরীমা শশব্যস্ত হইয়া ঠাকুরের মন্দিরে তাঁহার ভোজনের স্থান করিয়া দিলেন। ঠাকুর আহারে বসিলেন।

চারিদিকে ভক্তগণ—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া। সকলের চিত্ত নির্মল ও প্রসন্ন—আনন্দে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের সম্মুখে কেদারচন্দ্র উপবিষ্ট। তাঁহার অবস্থা কেমন?—

দেখিলেই প্রভুদেবে প্রায় বাক্যহারা।
অবিরত বিগলিত তুনয়নে ধারা॥
ভাবেতে বিহ্বল হেতু এত চোখে পানি।
জাহ্নবী যমুনা যেন নয়ন তুখানি॥

ঠাকুর কেদারচন্দ্রকে গৌরীমার পরিচয় দিলেন—তাঁহার ভক্তি-অনুরাগ ও তপস্যার কথা কহিলেন। শুনিয়া কেদারচন্দ্র গৌরীমাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিলেন। তখন—

কেদারে করিতে মাই প্রতিনমস্কার।
চারিচোখে দেখাদেখি হইল দোঁহার॥
প্রেমাবেশে বিহ্বল কাঁদেন তুইজনে।
আহা আহা বলেন শ্রীপ্রভু শ্রীবদনে॥
আপনে আপনি প্রভু হইয়া গমন।
উঠিলেন পরিহরি নিজের আসন॥

কে আর আহার করে কেবা খায় ভাত।
পাখালিয়া দিল ভক্তে অন্নমাখা হাত॥
কেহ দিল সম্মুখেতে তাম্বূল ধরিয়া।
কেহ দিল হাতে হুঁকা তামাক সাজিয়া॥

হুঁকা-হাতে ঠাকুর উত্তরদিকের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, ভক্তেরা তাঁহার শ্রীমুখে অবাক হইয়া চাহিয়া। দেখিতে দেখিতে—

ভাবেতে বিহ্বল 'বিষ্ণু' ভক্ত একজন।
ভূমিতে পড়িল জড় যষ্টির মতন॥
শ্রীমনোমোহন মিত্র উন্মত্তের প্রায়।
হাসিয়া লুটিয়া পড়ে শ্রীপ্রভুর পায়॥
আনন্দের বন্যা যেন হৃদি উথলিয়া।
বদনদুয়ারে যায় বাহির হইয়া॥

....

কেহ অর্ধবক্র ঠিক ধনুকের প্রায়।
কেহ বা পতিত ভূমে বাহ্য নাই গায়॥
কেহ বা ঢলিয়া অঙ্গে পড়য়ে কাহার।
কেহ অনিমিখ আঁখি শবের আকার॥
নিকটে দণ্ডায়মান বুদ্ধি আলথাল।
হাতেতে প্রভুর হুঁকা কাঁপেন রাখাল॥

....

আনন্দে উথলা হৃদি ভক্ত দত্ত-রাম।
উচ্চনাদে গায় জয় রামকৃষ্ণ নাম॥

সকলের দশা দেখিয়া, ঠাকুর হস্তদ্বারা জনে জনে স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের ভাব ভঙ্গ করিলেন। সকলে প্রকৃতিস্থ হইলে—

থালভরা প্রসাদ আছিল শ্রীমন্দিরে।
ভক্তগণ খায় মহা আনন্দের ভরে॥
প্রসাদে প্রসাদ জ্ঞান সমান সবার।
একত্র ভোজন, নাই জাতির বিচার॥ [পুঁ]

গোস্বামীকে কৃপা

শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারে বসু-বলরাম-ভবনে আছেন। শরতের অপরাহ্ণ। দ্বিতলের বৃহৎ ঘরখানি লোকে পরিপূর্ণ। মহাভক্ত শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সঙ্গী শ্রীকালীপদ ঘোষ মহোৎসাহে গান ধরিয়াছেন ঃ

আমায় ধর নিতাই,
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র (স্বামী সারদানন্দ) কোনরূপে ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—ঠাকুর সমাধিস্থ; ঘরের পশ্চিমপ্রান্তে পূর্বমুখী হইয়া বসিয়া। তাঁহার মুখে প্রসন্নতা ও আনন্দের অপূর্ব হাসি; দক্ষিণ চরণ প্রসারিত—একজন সম্মুখে বসিয়া পরম প্রেমের সহিত উহা হৃদয়ে ধরিয়া আছেন। ভক্তটির চক্ষু নিমীলিত, নয়নধারায় তাহার মুখ ও বুক ভাসিয়া যাইতেছে। গৃহ নিস্তব্ধ এবং একটা দিব্য ভাবের আবেশে জম্‌জম্ করিতেছে। গান চলিতে লাগিল—

আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন,
আমায় ধর নিতাই।

(নিতাই) জীবকে হরিনাম বিলাতে, উঠিল যে ঢেউ প্রেমনদীতে,
সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়ে যাই।
(নিতাই) খত লিখেছি আপন হাতে, অষ্টসখী সাক্ষী তাতে,
(এখন) কি দিয়ে শুধিব আমি প্রেমের মহাজন ;
(আমার) সঞ্চিত ধন ফুরাইল, তবু ঋণের শোধ না হল,
প্রেমের দায়ে এখন আমি বিকাইয়ে যাই।

গীত সাঙ্গ হইল। তাহার পরেও কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইল। ঠাকুর ক্রমশঃ অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন ও সম্মুখস্থ ভক্তটিকে বলিলেন, 'বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—বল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।' বারত্রয় তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করাইয়া ঠাকুর ক্রমে বাহ্যদশা লাভ করিলেন।

ভক্তটি গোস্বামি-সন্তান—যেমন ভক্তিমান, দেখিতেও তেমনি সুপুরুষ। [লী ৫।১১]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই'

'আমি যুগে যুগে অবতার।'

'এবার গুপ্তভাবে আসা—সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।'

'আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে তিন।

'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ।'

উপরিধৃত উক্তিগুলি বিভিন্ন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইয়াছে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে স্বীয় সনাতন-ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে যাইয়া তিনি ঐসকল উক্তি করিয়াছেন। ভবিষ্য ভক্তগণের জন্যও এইভাবে স্বরূপ-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন।

নরলীলা ঈশ্বরের প্রিয়, একথা আমরা তাঁহারই উক্তি হইতে জানিতে পারি। কিন্তু সকল অবতারে তিনি পূর্ণশক্তি লইয়া আসেন না, কিংবা পূর্ণশক্তি প্রকাশ করেন না। হয়তো এই কারণে, অথবা তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে জানিয়া, পুরাণাদি শাস্ত্রে অবতারগণের পূর্ণ-অংশাদি ভেদ কল্পিত হইয়াছে। রাম ও কৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম—ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ।

স্বরূপ-পরিচয়-প্রসঙ্গে ঠাকুর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের উক্তি করিলেও, রাম-কৃষ্ণ-রামকৃষ্ণের অভিন্ন-ব্যক্তিত্বের উপরেই বিশেষ জোর দিয়াছেন দেখা যায়। অপ্রকট হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে, ও অশেষ রোগযন্ত্রণার মধ্যে, শ্রীনরেন্দ্রনাথকে অন্তরে সংশয়াপন্ন বুঝিয়া সংশয়চ্ছেদী শক্তিপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন, 'নরেন, তোর এখনো সন্দেহ? যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ, কিন্তু তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।'

শ্রীমুখের বাণীতে ঠাকুর যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ষড়্ভুজ-মূর্তিতে কোন কোন বিশিষ্ট ভক্তের নিকটে প্রকট হইয়া ঠিক তাহাই করিয়াছেন। নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ—

ঊর্ধ্ব দুই হস্তে দেখে ধনু আর শর।
মধ্য দুই হস্ত বক্ষে—মুরলী অধর॥
অধ হস্তদ্বয়ে শোভে কমণ্ডলু দণ্ড।
... ...
রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ-মাধুরী মনোহর।
কিশোর-শেখর রসময় কলেবর॥ [ম ৩]

নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ যাহা দেখিয়াছিলেন, পুরীতে বাসুদেব সার্বভৌম ঠিক তাহাই দেখিলেন।

মুরারি-গুপ্তের কড়চায় সার্বভৌমকে ষড়্ভুজ প্রদর্শনের কথা নাই; কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে প্রদর্শনের কথা আছে। বর্ণনা প্রায় একই, কেবল অধ হস্তদ্বয়ে, দণ্ডকমণ্ডলু না থাকিয়া, পরমসুমধুর নৃত্যের ভঙ্গী।

ঊর্ধ্বং হস্তদ্বয়মপি ধনুর্বাণযুক্তঞ্চ মধ্যং
বংশীবক্ষঃস্থলবিনিহিতমুত্তমং গৌরচন্দ্রঃ।
শেষহস্তদ্বয়ঞ্চ পরমসুমধুরং নৃত্যাবেশং স বিভ্রৎ
এবং শ্রীগৌরচন্দ্রং নৃপপতিরখিলং প্রেমপূর্ণং দদর্শ॥ [মু ৪।১৬]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও সার্বভৌমকে ষড়্ভুজ প্রদর্শনের কথা নাই; চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ প্রদর্শনের কথা আছে:

---

১ দৈবকীনন্দন-দাসের বৈষ্ণব-বন্দনায় আছে:

প্রতাপরুদ্র রায় বন্দো ইন্দ্র-সম খ্যাতি
প্রকাশিলা প্রভু যাঁরে ষড়্ভুজ-আকৃতি॥

দেখাইল আগে তারে চতুর্ভুজ রূপ
পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ॥ [চ ২।৬]

'ভক্তমাল' শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনার সামঞ্জস্য করিয়া বলিতেছেন, সার্বভৌমকে মহাপ্রভু একদিন চতুর্ভুজ ও অন্যদিন ষড়্‌ভুজ মূর্তি দেখাইয়াছিলেন ঃ

আচম্বিতে ভট্টাচার্য দেখয়ে প্রভুরে।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম করে ॥
শ্যামল-সুন্দর বনমালা পীতবাস।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ স্বর্ণরেখা শ্রীনিবাস ॥
... ...
আর দিন ভট্টাচার্য দেখে আচম্বিতে।
ষড়্‌ভুজ প্রভু তিন-অবতার-মতে ॥
শ্যামবর্ণ দুই হস্ত মুরলী-বদন।
দূর্বাদলশ্যাম দুই হস্তে ধনুর্বাণ ॥
হেমবর্ণ দুই হস্তে দণ্ড কমুণ্ডল।
অপূর্ব সৌন্দর্য রূপ স্নিগ্ধ সুনির্মল ॥ [২১শ মালা]

পদকর্তা অনন্তদাস লিখিয়াছেন ঃ

উভদ্বয় ভুজপর খর শর চাপ।
হেরইতে রিপুগণ থরহরি কাঁপ ॥
... ...
তদধহিঁ দুহুঁ কর জলধর শ্যাম।
তহিঁ শোভে মোহন মুরলী অনুপাম ॥
... ...

তদধহি করহিঁ কমণ্ডলু্ দণ্ড।
যাহে কলিকলুষ পাষণ্ড খণ্ড॥
... ...
বসন সুরঙ্গ চরণ পরিয়ন্ত।
পদনখ নিছনি দাস অনন্ত॥ [ত ৩।১।৪৪]

এই ষড়্ভুজ-বর্ণনার অনুরূপ চিত্র ও মূর্তি সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন ষড়্ভুজমূর্তি নানাস্থানে পূজিত হইতেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে পুরীর সিদ্ধবকুল-মঠের বিগ্রহের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঠাকুর একদিন বৈকালে কলিকাতা গরাণহাটায় বৈষ্ণব সাধুদের আখড়ায় ষড়্ভুজ মহাপ্রভু দর্শন করিয়াছিলেন। [ক ৫।২।৩] আর একদিন শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বাটীতে চিত্রকর বাগ্‌চী তাঁহাকে কয়েকখানি চিত্র উপহার দিলে, ষড়্ভুজ-মূর্তি দেখিয়া আনন্দ করিতে করিতে ভক্তদিগকেও দেখাইয়াছিলেন। [ক ৪।২৯।১]

সুতরাং ঠাকুরের উক্তির অনুকরণ করিয়া মহাপ্রভু সম্বন্ধেও বলিতে পারা যায়: 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই কৃষ্ণচৈতন্য।'

মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্তগণের ভিতরেও যে এই বিশ্বাসই প্রচলিত ছিল, নিম্নোক্ত পদগুলি হইতে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

কেহ বোলে গোরা জানকীবল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানে
আমার গদাধরের প্রাণ রে॥ [ত ১।২।৪]

নয়নানন্দ পণ্ডিত-শ্রীগদাধরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও প্রিয়শিষ্য।

ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী।
কলিযুগে দণ্ডধারী হইলা সন্ন্যাসী॥

বাসুঘোষ কহে শুন নদীয়ানিবাসী।
বলরাম অবধূত, কানাই সন্ন্যাসী ॥ [ত ১।২।৪৭]

রাম অবতার ধনুক ধরিয়া,
গোকুলে পূরিলা বাঁশী।
এবে জীব লাগি করুণা করিয়া,
দণ্ড ধরিয়া সন্ন্যাসী ॥
ধরি নবদণ্ড, লইয়া করঙ্গ,
সিন্ধুতীরে কৈলা থানা।
রামানন্দ কয়, সন্ন্যাসীর বেশ নয়,
পাষণ্ডদলন বীরবানা। [ত ১।২।৪৯]

নবদ্বীপের বর্ণনায় মুরারি-গুপ্ত লিখিয়াছেন :

যত্র বিষ্ণুপদসম্ভবা সরিদ্
বেগবত্যতিতরা করুণার্দ্রা।
স্পর্ধয়া রবিসুতা-সরযূণাং
যা দধার কনকোজ্জ্বলং হরিম্ ॥ [মু ১।১]

যেখানে বিষ্ণুপদসম্ভূতা নদী (গঙ্গা) অতি বেগবতী ও করুণায় বিগলিতা, যিনি সরযূ ও যমুনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া কনকোজ্জ্বল হরিকে ধারণ করিয়াছিলেন।

এই বিষয়ে এত কথা বলিবার প্রয়োজন হইত না, যদি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ষড়্ভুজ বর্ণনা ভিন্নরূপ না হইত, এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সার্বভৌমের ষড়্ভুজ দর্শন সম্বন্ধে নীরব না থাকিতেন। ঐ দুই গ্রন্থের মতামত আলোচনা করিয়া ইদানীং কেহ কেহ শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের বর্ণনা ও তদনুরূপ প্রচলিত ষড়্ভুজ চিত্র ঠিক নহে—বলিতে আরম্ভ

করিয়াছেন।[২] চিত্র যদি ঠিক না হয়, তাহা হইলে পূজিত মূর্তিসকলও ঠিক নহে, প্রাচীন পদকর্তাদের বর্ণনাও ঠিক নহে। এই মত কতখানি সমীচীন, দেখা যাউক।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের মতে মহাপ্রভুর ষড়্ভুজে 'শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীহল-মুষল' ছিল। নিত্যানন্দপ্রভুর দর্শনকালে তো ছিলই, সার্বভৌমের দর্শনকালেও ছিল। যথা :

> শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
> রত্নমণি-পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল॥
> শ্রীবৎস কৌস্তুভ হার বক্ষে শোভা করে।
> বাম কক্ষে শিঙ্গা বেত্র মুরলী জঠরে॥ [ভা ৩৷৩]

বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবলরামের অবতার বলিয়া প্রথিত। বলরামের আয়ুধ হল ও মুষল দেখিবার ব্যগ্রতা বৃন্দাবনদাসের পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীচৈতন্যভাগবতে যত্রতত্র নিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা প্রচারের এক অস্বাভাবিক চেষ্টা যে পরিলক্ষিত হয় ইহা অনস্বীকার্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৃন্দাবন হইতে গোস্বামি-সিদ্ধান্তসমূহ প্রচারিত হইবার পরবর্তী কালে লেখা; এবং অধিকাংশ লীলাবর্ণনাই ঐ সিদ্ধান্তসমূহ প্রকাশ ও প্রচার করার উপযোগী ছাঁচে ঢালা। গোস্বামি-মতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান; আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত' হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র-প্রমুখ অবতারগণ তদীয় অংশ বা অংশাংশ মহাবিষ্ণুর অবতার মাত্র। সেই কারণেই কবিরাজ মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে

২ শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম্-এ, বিদ্যাবাচস্পতি-লিখিত "শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ-রূপ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামচন্দ্রের অভিন্নব্যক্তিত্ব দেখিতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন মনে করা অসঙ্গত নহে।

দুইজন সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের ভিন্নরূপ বর্ণনা সত্ত্বেও যখন লোচনদাস-বর্ণিত ষড়্ভুজ-মূর্তি বৈষ্ণব-সমাজে পরিগৃহীত দেখা গেল, তখন 'ভক্তমাল' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মানরক্ষায় অগ্রসর হইলেন এবং সার্বভৌম দুইদিনে দুইরূপ দেখিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহা সহজেই অনুমেয়, কেননা বাঙ্গলা ভক্তমালের লেখক বহু বহু পরবর্তী কালের লোক। দুইদিনে দুইরূপ দেখার জনশ্রুতি থাকিলে তৎপূর্বেই কোন গ্রন্থকার উহা লিপিবদ্ধ করিতেন।

সার্বভৌমের দর্শন হইতেই ষড়্ভুজ-মূর্তি প্রচলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পুরী-অঞ্চলে উহা বিশেষভাবে, মন্দিরে ও মন্দিরগাত্রে, দৃষ্টি-গোচর হয়। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অধিকাংশ সংস্করণ হইতে সম্ভবতঃ সেই কারণেই সার্বভৌমদৃষ্ট ষড়্ভুজের বিশেষ বর্ণনা—উপরিধৃত চারি পংক্তি—বাদ দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

'ভাবের ইতি নাই'

স্বামী বিবেকানন্দ একদা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, 'সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে যতটুকু বুঝেচে, প্রভু বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনন্তভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ত্তা হয় তো প্রভুর অগম্য ভাবের ইয়ত্তা নাই।'[১] স্বামিজীর এই উক্তি ভগবান শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হইতে পারে। মানুষের পক্ষে তাঁহাদের কাহারও ভাবরাশি সমগ্রভাবে বুঝিয়া ফেলিবার চেষ্টা বামনের চাঁদ ধরিবার প্রয়াসের সমতুল্য। তথাপি মানুষ যে তাঁহাদের ভাব কথঞ্চিৎ ধরিবার বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহার কারণ—

জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন।
আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ॥ [চ ৩।১৮]

শ্রীচৈতন্যের অগম্য ভাব

ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার।
যাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার॥
কভু ত লৌকিক রীত—যেন ইতর জন।
কভু স্বতন্ত্র—করেন ঐশ্বর্য প্রকটন॥
কভু রামচন্দ্রপুরীর হয়ে ভৃত্যপ্রায়।
কভু তারে নাহি মানে, দেখে তৃণপ্রায়॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর—বুদ্ধি-অগোচর।
যবে যেই করে সেই সব মনোহর॥ [চ ৩।৮]

---

১ স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ১।৭

ঈশ্বরভাবে—

যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব-শিরের উপর॥

আবার—

খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব, সভাকার স্থানে।
অসর্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে— ॥
কিছু-নি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ আমারে যেন তখনেই মরোঁ॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণ ধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম।
তোমরা আমার ভাই বন্ধু জন্মজন্ম॥
কৃষ্ণদাস্য বই মোর আর নাহি গতি।
বলিহ আমারে পাছে হয় অন্যমতি॥ [ভা ২।১৬]

মহাপ্রভুর মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবের সম্মিলন ছিল। প্রকৃতি-ভাবে সাধনায় ও প্রকৃতির ভূমিকায় অভিনয়প্রিয়তায় তাঁহার প্রকৃতি-স্বরূপটিই যেন আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে। রায় রামানন্দ ভাবচক্ষে তাঁহাকে প্রকৃতি-ভাবাবৃত পুরুষরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

তাঁহার ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশ সকল ভক্তের কাছে একরূপ নহে। বিভিন্ন ভাবের ও বিভিন্ন মন্ত্রের উপাসক বৈষ্ণব ভক্তেরা তাঁহাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে দর্শন করিয়াছিলেন।

যার যেন-মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই বিশ্বম্ভর দেখে সেই অবতার॥

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেইমত দেখায় ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥ [ভা ২।১০]

কেবল বৈষ্ণব ভক্তেরাই নহে, শৈব ভক্তেরাও তাঁহাকে সাক্ষাৎ শিব জ্ঞান করিয়াছেন দেখা যায়। আর সর্বসমক্ষে তিনি শক্তিগণের ইষ্ট-দেবতা আদ্যাশক্তিরূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত উড়িয়া বৌদ্ধভক্তেরা তাঁহাকে শ্রীবুদ্ধের অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন।[২] নিরাকারবাদী জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসীরাও তাঁহার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ ছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে প্রচারিত গোস্বামি-শাস্ত্রে মহাপ্রভু 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া প্রচারিত হইয়াছেন। রাধাভাব আস্বাদনের জন্যই শ্রীমতীর ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপে প্রকাশ। এই সিদ্ধান্ত ক্রমশঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র স্বীকৃত ও সাধনাঙ্গে গৃহীত হওয়ায়, মহাপ্রভুকে অন্যান্য ভাবে দেখিবার চেষ্টা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল। ইদানীং সেই প্রয়াস আবার জাগ্রত হইয়াছে, এবং মহাপ্রভু কেবলমাত্র 'রাধাকৃষ্ণ' রূপে উপাসিত না হইয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ 'শ্রীগৌরাঙ্গ' রূপেও উপাসিত হইতেছেন।

প্রকটলীলায় মহাপ্রভু বিভিন্ন ভক্তের সঙ্গে শান্ত-দাস্যাদি সকল ভাবেই সম্বন্ধ ছিলেন, সুতরাং সকল ভাবেই তাঁহার উপাসনা হইতে পারে। এইরূপ সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু মহাপ্রভুতে পতিভাব আরোপ করিয়া তাঁহাকে মধুরভাবে উপাসনা করার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি প্রাচীন কালেই উত্থিত হইয়াছে দেখা যায়। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন :

'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণো না করিলা—বিদিত সংসারে ॥

[২] শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ১৫শ অধ্যায়

অতএব যত মহামহিম সকলে।
'গৌরাঙ্গনাগর' হেন স্তব নাহি বোলে॥ [ভা ১।১০]

বৃন্দাবনদাস এইরূপ লিখিলেও, মহামহিম চৈতন্য-পার্ষদ সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে' গৌরনাগরবরকে ধ্যান করিয়াছেন। যথা:

কোঽয়ং পট্টধটী-বিরাজিত-কটীদেশঃ করে কঙ্কণং
হারং বক্ষসি কুণ্ডলং শ্রবণয়ো বিভ্রৎ পদে নূপুরম্।
ঊর্ধ্বীকৃত্য নিবদ্ধকুন্তলভর-প্রোৎফুল্লমল্লীস্রগা-
পীড়ঃ ক্রীড়তি গৌরনাগরবরো নৃত্যন্নিজৈ র্নামভিঃ॥

কে এই গৌরনাগরবর, যিনি স্বীয় নাম কীর্তন করিয়া নাচিতে নাচিতে ক্রীড়া করিতেছেন—যাঁহার কটিতে পট্টবস্ত্র, করে কঙ্কণ, বক্ষে হার, কানে কুণ্ডল ও পায়ে নূপুর—যাঁহার নিবদ্ধকুন্তলভার ঊর্ধ্বীকৃতভাবে স্থাপিত ও প্রফুল্ল মল্লিকাফুলের মালায় শোভিত।

শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ বা সমসাময়িক ভক্ত বাসুদেব ঘোষ, নরহরি, নয়নানন্দ প্রভৃতি মহাজনগণ ঐ ভাব-সাধনার অনুকূল পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুতে পতিভাব আরোপ করিয়া সাধকগণের সিদ্ধাবস্থা-প্রাপ্তির কথাও শুনা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণও ঐ ভাবের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি কখন কখন এই পদটি গাহিতেন:

পাড়ার লোকে গোল করে মা, আমায় বলে গৌর-কলঙ্কিনী।
একি কইবার কথা, কইবো কোথা, লাজে মলাম ওগো
প্রাণসজনী॥

গীতামুখে প্রচারিত শ্রীভগবানের বিরোধভঞ্জন উক্তি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—শ্রীচৈতন্যাবতারেও একবার প্রমাণিত

হইয়াছে। সকল ভাবের ভাবী সর্বেশ্বরকে সম্যগ্‌রূপে ধরিতে বুঝিতে না পারার ফলে, এবং কালের প্রভাবে, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট একদেশী মতবাদসমূহ প্রচারিত হইয়াছে।[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণের অগম্য ভাব

শ্রীচৈতন্যের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণেও পরস্পরবিরোধী দেব ও মানব ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। "সকলের কাছে নীচু, নম্রভাব—একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট—এতটুকু অহঙ্কার নেই!...'গুরু' কি 'বাবা' কি 'কর্তা' বলে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই পারতেন না; বলে উঠতেন—'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোদের গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই'—বলেই হয়ত আবার তার পায়ের ধুলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন!" [লী ১।৩]

আবার, "দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব নেশার ঝোঁকে নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনও অনুভব করে নাই, এপ্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত—তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এই ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন...। ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞান-তিমিরান্ধ, ত্রিতাপতাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্রাতা এবং

৩ 'শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একদল ভক্ত শ্রীচৈতন্যের মুখ দিয়া শূন্যবাদ, একদল যৌগিক বা তান্ত্রিক সাধনা, একদল কৃষ্ণভাব, একদল গোপীভাবের কথা বলাইয়াছেন'—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, ৯ম অধ্যায়।

শ্রীভগবানের পরমপদের দর্শয়িতা!...আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি।...ঠাকুর বলিতেন—শ্রীভগবানের 'ইতি' নাই। আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের 'ইতি' নাই।" [লী ১।৩]

ঠাকুরের মধ্যে আবার স্ত্রীভাব ও পুরুষভাবের একত্র সমাবেশ দেখা যায়। "ঠাকুরের নিজের পুরুষশরীর ছিল, সেজন্য তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি—কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন—তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, 'ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না। মনে হইত যেন আমাদেরই একজন। সেজন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না।'

"উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে। পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে।...ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন—'মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, 'জানি না!'" [লী ১।১]

ঠাকুরকে সকল মতের, সকল পথের সাধকেরাই নিজ নিজ ভাবের লোক বলিয়া মনে করিতেন। যাঁহারা বিশেষভাবে সাধনায় অগ্রসর, তাঁহারা তাঁহাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে দর্শন করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছেন। শাক্ত, শৈব এবং রামাৎ-গৌড়ীয়-কর্তাভজাদি-শ্রেণীভুক্ত বৈষ্ণব সিদ্ধ-পুরুষেরা তাঁহাকে নিজ নিজ ইষ্টরূপে পূজা করিয়া গিয়াছেন; জ্ঞানপন্থী সাধকেরা তাঁহাকে নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন পরমহংসরূপে দর্শন করিয়াছেন; হিন্দুধর্ম হইতে উদ্‌গত ও বৈদেশিক সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে জাত শিখ ও ব্রাহ্মমতের সাধকেরাও তাঁহার মধ্যে নিজেদের আদর্শের পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের অশেষ শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন; এবং সমুন্নত খৃষ্টান সাধক ধ্যানযোগে তাঁহাকে সাক্ষাৎ যীশুখ্রীষ্ট-রূপে দেখিতে পাইয়া, চাক্ষুষ দর্শন করিবার জন্য দূরদেশ হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন!

গীতামুখে প্রচারিত শ্রীভগবানের সমন্বয়-বাণী শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে পরিস্ফুটভাবে ও পরিপূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যাবতারে জ্ঞানের ভাব অনেকটা ভিতরে গুপ্ত ছিল। তাঁহার সময়ে এদেশে হিন্দুকে পৌত্তলিক প্রমাণিত করিবার জন্য বৈদেশিক খ্রীষ্টধর্মের আমদানি হয় নাই, এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মতবিরোধ বর্তমান থাকিলেও সেই বিরোধ এতটা ব্যাপক ও উগ্র হইয়া উঠে নাই। আবার জড়বিজ্ঞান-গর্বিতা সভ্যতার দাপটে পৃথিবীর সর্বত্র মানবের ধর্মবিশ্বাসটাই এযুগের মত আর কোন কালে এতটা আঘাতপ্রাপ্ত ও শিথিল হয় নাই। তাই ঠাকুরের দ্বাদশবর্ষব্যাপী অশ্রুতপূর্ব সাধনা যেমন বিরাট ও গভীর, উহার সিদ্ধিও তেমনি পৃথিবীময় সর্বকালের মানবজাতির উন্নতিকল্পে নিয়োজিত। শ্রীচৈতন্যাবতারে ভগবান যে সমন্বয়ের সূচনা করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণা-বতারে তাহাকেই পরিপূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন।

যত ধর্ম দেহ তাঁর ভাব যত রূপ।
সকলের মধ্যে তিনি প্রাণের স্বরূপ॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রণামমন্ত্রে ঠাকুরকে 'সর্বধর্মস্বরূপী' বলিয়াছেন। পূজা-কালে ভক্তেরা তাঁহাকে 'সর্বদেবদেবীস্বরূপ' বিশেষণে বিশেষিত করেন এবং ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাতে দাস্যাদি যে-কোন ভাব আরোপ করেন। ভাবময় ঠাকুর শ্রীমুখে বলিয়াছিলেন, 'অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখচি, তার মধ্যে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এটিও একটি' এবং স্বহস্তে ফুলচন্দন দিয়া নিজের পট পূজাও করিয়াছিলেন। একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি, দেব ও মানব, সাধ্য ও সাধক—অনন্তভাবময় ঠাকুরকে যে-কোন ভাবে গ্রহণ করিবার, চিন্তা করিবার, পূজা করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

পরিশিষ্ট

কতিপয় বৈষম্য ঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-চরিত্র

শ্রীভগবানের দুই বিভিন্ন যুগ-লীলায় কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। এখানে ঐরূপ কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিব।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলী জেলায় ও তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী সারদা-দেবী বাঁকুড়ায় পরস্পর সন্নিকটবর্তী দুই গ্রামে শরীর পরিগ্রহ করেন। তদীয় ঈশ্বরকোটি-পার্ষদ শ্রীপ্রেমানন্দ হুগলীর অধিবাসী। ঐ ঈশ্বরকোটি-শ্রেণীর শ্রীবিবেকানন্দ, শ্রীব্রহ্মানন্দ, শ্রীযোগানন্দ, শ্রীনিরঞ্জনানন্দ ও শ্রীপূর্ণ-চন্দ্র ঘোষ[১] এবং বিশিষ্ট অন্তরঙ্গশ্রেণীর শ্রীসারদানন্দ-প্রমুখ সন্ন্যাসী ও শ্রীবলরাম বসু-প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ কলিকাতার অথবা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানসমূহের অধিবাসী। শ্রীদুর্গাচরণ নাগ পূর্ববঙ্গের একমাত্র উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ভক্ত এবং ঠাকুরের তন্ত্রসাধনার গুরু ভৈরবী শ্রীযোগেশ্বরী পূর্ববাঙ্গলার মেয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাবিস্তারে ও আদিম ভাবপ্রচারে পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গের প্রভাব সমধিক।

শ্রীচৈতন্যাবতারে কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ ছিল। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদীয় একতর বাহুস্বরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যপ্রভু শ্রীহট্টের সন্তান। তাহা ছাড়া—

শ্রীবাস পণ্ডিত, আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্যপূজিত ॥

১ ঈশ্বরকোটি ছয়জন ভক্তের নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী সারদানন্দ ঐ ছয়জনের প্রতিরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে মুদ্রিত করিয়া প্রকারান্তরে উঁহাদের বিশেষত্ব খ্যাপন করিয়াছেন।

ভবরোগবৈদ্য শ্রীমুরারি নাম যাঁর।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার ॥ [ভা ১।২]

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরিকর শ্রীবাসুদেব ঘোষ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমাধব শ্রীহট্টের বুড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২]

আবার—

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণবপ্রধান।
চৈতন্যবল্লভ 'দত্ত বাসুদেব' নাম ॥
চাটিগ্রামে হৈল ইঁহা সভার প্রকাশ। [ভা ১।২]

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের পূর্বনিবাস ছিল চট্টগ্রামে। শ্রীচৈতন্যের পরমপ্রিয় গায়ন শ্রীমুকুন্দ দত্ত পয়ারোক্ত বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সুতরাং নবদ্বীপ-লীলার বিশিষ্ট পার্ষদগণের অধিকাংশই পূর্ববঙ্গের লোক। 'পঞ্চতত্ত্বে'র তিন তত্ত্বই—অদ্বৈত-চৈতন্য-শ্রীবাস—শ্রীহট্টকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় পার্ষদ শ্রীমুরারিগুপ্ত দেবভাষায় তাঁহার আদি চরিতামৃতলেখক। আবার নবদ্বীপে তাঁহার ও শ্রীবাস-পণ্ডিতের অঙ্গনই মহাপ্রভুর প্রধান লীলাবিলাসের স্থান ছিল। ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন : 'বঙ্গদেশ আজ শ্রীহট্টের শাসন মানিয়া লইয়াছে, শ্রীহট্টের এক ব্রাহ্মণকুমার অনুরাগের রাজদণ্ড লইয়া এই বিশাল ভূভাগ শাসন করিতেছেন।'[৩]

শ্রীচৈতন্যাবতারে বাঙ্গলার পূর্বপ্রান্ত হইতে, ও শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে উহার পশ্চিমপ্রান্ত হইতে প্রধান ধর্মতরঙ্গ উত্থিত হইয়া, তৎকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি নবদ্বীপ ও কলিকাতায় আসিয়া উত্তাল

---

২ তাঁহাদের পিতা কুমারহট্টে বাস করিতেন, পরে তাঁহারা নবদ্বীপে উঠিয়া যান। তাঁহারা সুকণ্ঠ ও সুকবি ছিলেন, চৈতন্যদেবের অধীনে তিনটি সংকীর্তনদলের নেতৃত্ব করিতেন।

৩ বৃহৎবঙ্গ : পরিশিষ্ট, ১০ম পরিচ্ছেদ।

আকার ধারণ করিয়াছে, এবং তথা হইতে চারিদিকে প্রসৃত হইয়া দূরদূরান্তর আপ্লাবিত করিয়াছে ও করিতেছে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই জীবন ত্যাগ ও বৈরাগ্যের নিখুঁত জ্বলন্ত আদর্শ। মহাপ্রভু বলিতেন :

সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায়।
শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥ [চ ২।১২]

ঠাকুরও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। তাঁহারা দুইজনেই ত্যাগীশ্বর সন্ন্যাসী—দুইজনেই বিষয়বিলাসের বহু বহু উর্ধ্বে ভূমানন্দ-ভূমিতে বিচরণ করিতেন। জগতের যাবতীয় ভোগ—মায়ার মোহিনী মূর্তি—জীবনে একটিবারও তাঁহাদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

তাঁহাদের ত্যাগাদর্শ স্বরূপে একই রূপ হইলেও, বহিঃপ্রকাশে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। মহাপ্রভু বাহ্য আচরণে যতটা কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন, ঠাকুর ততটা করেন নাই। দৃষ্টান্ত যথা :

১। শুষ্কজ্ঞানী রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর আহার্যবিষয়ে ছিদ্রান্বেষণ করিয়া বেড়াইতেন। পরের ছিদ্রান্বেষণ করাই ছিল তাঁহার স্বভাব। একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভুর গৃহে পিপীলিকা দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'রাত্রে এখানে মিষ্টদ্রব্য ছিল, তাই পিপীলিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; বিরক্ত সন্ন্যাসীদের কী ইন্দ্রিয়লালসা!' দুর্মুখ মন্তব্য করিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। পিপীলিকা স্বভাবতঃ যত্র তত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু পুরীর নিন্দায় মহাপ্রভু অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইলেন এবং নিত্যকার আহার্য কমাইয়া অর্ধেক করিয়া দিলেন। কিছুকাল তিনি অর্ধাশনই করিয়াছিলেন।

ঠাকুর আহার্য বিষয়ে এতটা কঠোরতা কোন কালেই করেন নাই। যখন যাহা প্রয়োজন, এবং যখন যাহা জুটিয়াছে, শরীর-পোষণের জন্য তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন।

২। মহাপ্রভু ভূমিতে 'কলার শরলা' বিছাইয়া তদুপরি শয়ন করিতেন। 'শরলাতে হাড় লাগে, ব্যথা লাগে গায়।' ভক্তগণ তাহা দেখিয়া মহাদুঃখিত হইলেন। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রভুর জন্য এক 'তুলীগাণ্ডু' প্রস্তুত করাইয়া আনিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাহাতে শয়ন করিতে সম্মত হইলেন না; স্বরূপদামোদরের উপরোধের উত্তরে কহিলেন:

খাট এক আনহ পাড়িতে।
জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে?
সন্ন্যাসিমানুষ, আমার ভূমিতে শয়ন।
আমাকে খাট, তুলীগাণ্ডু—মস্তকমণ্ডন?
স্বরূপগোসাঞি তবে সৃজিল প্রকার।
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার॥
নখে চিরি চিরি তাহা অতি সূক্ষ্ম কৈল।
প্রভুর বহির্বাস-দুইতে সেসব ভরিল॥
এইমত দুই কৈল ওঢ়ন-পাড়নে।
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে॥ [চ ৩।১৩]

ঠাকুর শয্যাদি বিষয়ে এরূপ কঠোরতা করিতেন না, খাটের উপর তোষক বিছাইয়া তাহাতে শয়ন করিতেন।

মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাসকে যেসকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি—'ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে।' রঘুনাথ অক্ষরে অক্ষরে সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। রূপ-সনাতন-প্রমুখ মহাপ্রভুর

ত্যাগী সন্তানেরা সকলেই ছিন্নকন্থাধারী, অতিকঠোর তপস্বী। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা তাঁহার শিক্ষানুযায়ী 'যখন যেমন তখন তেমন', 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন' আচারের পক্ষপাতী। তাঁহারা কৌপীনমাত্র ধারণ করিয়া অনাহারে অর্ধাহারে সুকঠোর তপস্যা করিয়াছেন, আবার লোকসমাজে কার্য করিবার সময় প্রয়োজনানুরূপ পরিধেয় ও আহার্য গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। সন্ন্যাসজীবনে মহাপ্রভু স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অতি কঠোর নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি মা ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোককে সম্ভাষণাদি করেন নাই। পুরীধামে সমাগত ভক্ত-স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে দূর হইতে দর্শন করিতেন। ছোট হরিদাস বৈরাগী হইয়া এক ভক্ত-স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করায় তিনি তাহাকে নির্মমভাবে বর্জন করিয়াছিলেন। সে মহাপ্রভুর কাছে আসিতে না পারিয়া উপবাস করিতেছে শুনিয়া বলিয়াছিলেন :

বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥

তাঁহার কঠোর উদাসীনতা সহ্য করিতে না পারিয়া হরিদাস অবশেষে প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহবিসর্জন করিল। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভু হাসিমুখে কহিলেন, 'প্রকৃতিদর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।' [চ ৩।২]

ঠাকুর 'কামিনী'কে সর্বপ্রযত্নে বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়াও সহধর্মিণীকে ত্যাগ করেন নাই; তাঁহাকে সর্বপ্রকার শিক্ষা দান ও তাঁহার সপ্রেম সেবা স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। ভক্ত-স্ত্রীলোকেরা তাঁহার উপদেশাদি লাভে ধন্য হইতেন। তবে তিনি অধিকক্ষণ স্ত্রীলোকের নিকটে থাকিতেন না; ভক্ত হইলেও বেশীক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিতেন না। তাঁহার ত্যাগী সন্তানদিগকেও ঐরূপ করিতে শিক্ষা

দিতেন। ক্বচিৎ কাহারও চিত্তের দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কৃতাপরাধের জন্য কাহাকেও বর্জন করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না।

দুই মহাপুরুষের দুইরূপ আচরণের কারণ অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, একমাত্র যুগপ্রয়োজনই উহার মূলে। মহাপ্রভু যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সে যুগে ত্যাগ ও ধর্মের নামে ব্যভিচার ও বিষয়ভোগ সমাজে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে নিজের ও নিজভক্তের উপরে এমন কঠোর ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তিনি জগদ্‌গুরু, তাই আত্মবিসর্জন দিয়া আদর্শ স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। ঐ একই কারণে তিনি পরমভক্ত মহারাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সঙ্গেও দেখা করিতে চাহেন নাই। বলিয়াছিলেন :

> রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইলোক নাশ।
> পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস॥
> ... আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
> কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥ [চ ২।১২]

ঠাকুর যে যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই অনতিক্রান্ত বর্তমান যুগেও মানুষের চিত্ত অতিমাত্রায় বিষয়াসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এযুগে ধর্মের নাম লইয়া সাধারণতঃ লোকে বিষয়ভোগ করিতে যাইত না। পাশ্চাত্ত্যের জড়বাদসর্বস্ব আদর্শে অভিভূত হইয়া তাহারা বিষয়ভোগকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং ধর্ম জিনিসটা উপহাসের ও অবিশ্বাসের বস্তু হইয়া উঠিতেছিল। তাই ঠাকুর কঠোর সাধনা করিয়া সর্বাগ্রে ধর্মের সর্বাঙ্গীণ সত্যতা প্রমাণিত করিলেন, এবং শরীর-পোষণের জন্য যেটুকু ভোগ গ্রহণ না করিলে নয় অনাসক্ত হইয়া সেইটুকু মাত্র গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, কলিতে একে অন্নগত প্রাণ, তাহাতে আবার ম্যালেরিয়ারোগে কাবু করিয়া ফেলে। সেইজন্য

তিনি অতিমাত্রায় শারীরিক কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না ; এমনকি বিধবাদিগকেও নির্জলা উপবাস করিয়া শরীর-পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

ঈশ্বর, আত্মা ইত্যাদি বস্তুতে বিশ্বাস না করিয়াও, অথবা বিশ্বাস করিলেও তদুপলব্ধির কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া এযুগের মানুষ বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়াইয়াছে এবং বাস্তবজীবনে সেই আদর্শকে রূপদান করিতে চাহিয়াছে, যদিও কৃতকার্য হয় নাই। ঐরূপ একটি আদর্শের কল্পনা এই যে, নরনারী নিঃসঙ্কোচে পরস্পর মেলামেশা, আদানপ্রদান, ভাববিনিময় করিবে, সংসারে একে অন্যকে সাথী, সুহৃৎ ও বন্ধুরূপে লাভ করিবে, অথচ উহার মধ্যে কিছুমাত্র মলিনতা, চিত্তবিকৃতি বা নীচস্বার্থ থাকিবে না। ঠাকুর আত্মবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, রমণী-মাত্রে জগজ্জননীর বিশেষ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া এবং প্রকৃতিভাব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া স্বীয় সহধর্মিণীকে সেবা ও সাহচর্যে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত আত্মজ্ঞানে স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ-বুদ্ধির উদয় হইত না, যদি বা কখনো উহার ঈষন্মাত্র উদয় হইত, তিনি পত্নীর ভিতর নিজের ইষ্টমূর্তি জগদম্বিকাকেই দেখিতে পাইতেন ; কখনো বা নিজের পুরুষসত্তা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে ও সহধর্মিণীকে জগদম্বিকার সখী বা দাসী মাত্র জ্ঞান করিতেন—দুইজনেই জগন্মাতার সখী বা দাসী। ঠাকুরের পত্নী-সম্বন্ধীয় আচরণের সমুদয় রহস্য ভেদ করা আমাদের মত মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু তাঁহার ঐ আচরণ যে নরনারীর বহু-আকাঙ্ক্ষিত পূর্বোক্ত আদর্শকে রূপায়িত করিয়াছে, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীমতী লক্ষ্মী সর্পদংশনে অকালে লোকান্তরিতা হন। মহাপ্রভু তখন পূর্ববঙ্গে পদ্মাতীরে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গগতপ্রাণা লক্ষ্মী ইহজীবনে অধিকদিন স্বামি-সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া 'পরমসুচরিতা' ও ভগবদ্‌ভক্তিপরায়ণা ; আবাল্য প্রতিদিন দুইতিন বার গঙ্গাস্নান করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা শ্রীসনাতন মিশ্র 'মহাবংশজাত', 'রাজপণ্ডিত'-আখ্যাধারী, পরোপকারী ; অনায়াসে অনেকের ভরণপোষণ করিতেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহও রাজোচিত আড়ম্বরে নিষ্পন্ন হইয়াছিল ; ভাগ্যবান বুদ্ধিমন্তখান্ ও মুকুন্দ-সঞ্জয় স্বেচ্ছায় সকল ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। 'নিমাই পণ্ডিত' তখন নবদ্বীপের প্রখ্যাত অধ্যাপক।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াও অধিকদিন স্বামি-সেবা করিতে পাইলেন না ; স্বামী ভগবৎপ্রেমে বাহ্যহারা হইলেন। প্রেমময়ী পত্নী কিছুদিন ধরিয়া স্বামীর প্রেমে-মাতোয়ারা আনন্দ-মূর্তি দর্শন করিলেন ; তারপরে বিধাতার নিবন্ধ হঠাৎ একদিন উভয়ের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ-যবনিকা টানিয়া দিল—স্বামী সন্ন্যাস করিয়া দেশত্যাগী হইলেন।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিতকারগণ কী বুঝিলেন বলিতে পারি না ; তাঁহারাও যেন পরস্পর পরামর্শ করিয়াই একযোগে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্কচ্ছেদ করিলেন—অনর্গল লেখনী চালনা করিয়া যাঁহার বিবাহের ঘটার বর্ণনা করিয়াছেন, নির্বিকারচিত্তে তাঁহাকে নবদ্বীপের এক গৃহকোণে সেই যে রাখিয়া গেলেন, আর একবারও ফিরিয়া দেখিতে আসিলেন না!

চরিতকারগণ এইরূপ অমার্জনীয় উদাসীনতা দেখাইলেও, স্বয়ং মহাপ্রভু যে অন্তরে পত্নীর প্রতি একান্ত উদাসীন ছিলেন না, কোন কোন ঘটনায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীদামোদর পণ্ডিতকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন :

দামোদর! চলহ নদীয়া।
মাতার সমীপে তুমি রহ তাঁহা যাঞা॥

তোমা-বিনা তাঁহে রক্ষক নাহি দেখি আন।
আমাকেই যাতে তুমি কৈলে সাবধান॥

তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম না যায় রক্ষণে॥

আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমাকে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়॥

মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে।
তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে॥ [চ ৩৷৩]

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর তাঁহার জননীকে দেখাশুনা করিবার জন্য দামোদর পণ্ডিতের মত একজন প্রবীণ লোকের যে প্রয়োজন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লোকব্যবহারে অভিজ্ঞা, ভগবৎপরায়ণা, বৃদ্ধা মাতার 'স্বচ্ছন্দাচরণ' যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য লোক নিযুক্ত করার কোনই মানে হয় না। সুতরাং সাংসারিক বিষয়ে ও লোকব্যবহারে অনভিজ্ঞা বালিকা বধূকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি শেষোক্ত কথাটি—'তোমার আগে নহিবে কারো স্বচ্ছন্দাচরণে'—বলিয়াছেন নিশ্চয়। মহাপ্রভু চাহিতেন, যে মহাকার্য সাধনার উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহার শক্তিরূপা সহধর্মিণীও অনুকূল আচরণ করিয়া সেই কার্যে সর্বতোভাবে সহায় হন—তাঁহার ত্যাগময় ও সেবাময় জীবন নারীগণের আদর্শস্থানীয় হইয়া উঠে। পত্নীকে স্বয়ং শিক্ষাদান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যে কাজটি নিষ্পন্ন করিয়াছেন, পত্নী হইতে দূরে থাকিয়া ও আপাতদৃষ্টিতে পত্নীর সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়াও মহাপ্রভু ঠিক তাহাই করিতে চাহিয়াছেন। সন্ন্যাসের পূর্বে মহাপ্রভু যেমন মাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়াছিলেন, তেমনি পত্নীকেও প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়াছিলেন কিনা কে বলিবে!

মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া কঠোর তপশ্চর্যায় আত্মনিয়োগ করেন। সমস্ত দিন তিনি ভগবন্নাম-জপে অতিবাহিত করিতেন, এবং দিনান্তে, জপসংখ্যা রাখিবার জন্য ব্যবহৃত মুষ্টিমেয় তণ্ডুল জলে সিদ্ধ করিয়া ইষ্টকে নিবেদনপূর্বক যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ ধারণ করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় না।

তাঁহার তপস্যাময় সুমহৎ জীবনের যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য অঙ্কিত না থাকায় মানবজাতি সেই মানবীরূপা দেবীর চরিতানুধ্যানে একরূপ বঞ্চিতই হইয়াছে; এবং তাঁহার অকৃতজ্ঞ সন্তান—বাঙ্গালী আমরা মায়ের মহিমমণ্ডিত সমগ্র রূপ প্রাণ ভরিয়া দেখিতে না পাইয়া আজ অন্তরে কেবল ক্ষুব্ধই হইতেছি।

—

সমাজনৈতিক সমস্যার সমাধান : শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা

স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছেন : 'সমুদয় ভারতেই শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানেই লোক ভক্তিমার্গ জানে, সেখানেই তাঁহার বিষয় লোকে আদরপূর্বক চর্চা করিয়া থাকে ও তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। আমার বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে যে, সমুদয় বল্লভাচার্য-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের শাখাবিশেষ মাত্র। কিন্তু তাঁহার তথাকথিত বঙ্গীয় শিষ্যগণ জানেন না, তাঁহার প্রভাব এখনও কিরূপে সমগ্র ভারতে কার্য করিতেছে। ···তিনি নগ্নপদে ভারতের দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া আচণ্ডালকে ভগবানের প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইতে ভিক্ষা করিতেন।'[১]

প্রেমধর্মে শ্রীচৈতন্যের দান শাশ্বত ও প্রভাব ভারতব্যাপী। সমগ্র বাঙ্গলায় এবং উড়িষ্যা ও আসামের কিয়দংশে এই প্রভাব সর্বাধিক।

ভারত ধর্মপ্রাণ বলিয়া এখানে সমুদয় বিপ্লব ধর্মের নামে সংসাধিত হয়। ভারতে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েরই সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ—স্বামিজী লিখিয়াছেন।[২] ভগবান শ্রীচৈতন্য হইতে প্রবর্তিত সম্প্রদায় বাঙ্গলার তৎকালীন সামাজিক সমস্যার কিভাবে কতখানি সমাধান করিয়াছেন এই অধ্যায়ে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীচৈতন্য যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, সেই সময়ে বাঙ্গলায় মুসলমান-রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং রাজশক্তি ও 'কাফের'-বিদ্বেষ সম্মিলিত হইয়া ছলে-বলে-কৌশলে তীব্রবেগে এদেশের লোককে, বিশেষতঃ অনুন্নত নিম্নশ্রেণীর লোকসমূহকে মুসলমান করিয়া লইতেছে। উচ্চ-

---

১ হিন্দুধর্মের সার্বভৌমিকতা। ২ বর্তমান ভারত।

শ্রেণীর বা ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ জাতির লোকসংখ্যা নিম্নশ্রেণীসমূহের লোকসংখ্যার তুলনায় নগণ্য, ঐ উচ্চশ্রেণীর লোকদের অধিকাংশই তখন শক্তিপূজক বা শাক্ত ; এবং শক্তি-পূজাপদ্ধতিও বিকৃত বামাচারে কলুষিত হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ লোকই বিকৃত বৌদ্ধমত-সমূহ গ্রহণ করিয়া নানা উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত। কাহারও কাহারও মতে, অন্ত্যজ শ্রেণীর অনেক লোক তখনও হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রভাবের বাহিরে ছিল বা তাহাদের কোন ধর্মই ছিল না। এই অবস্থায় সমাজ-ব্যবস্থা তখন অত্যন্ত শিথিল। বিকৃত উপধর্মসমূহের মতবাদ ও আচারে পঙ্কিল, সুতরাং নৈতিক হিসাবে অত্যন্ত দুর্বল, বহুধা বিভক্ত বিরাট সমাজের উপর হিন্দু সমাজপতিগণের বিশেষ প্রভাব নাই ; এবং যেটুকু আছে, কালোচিত বিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির অভাবে উদার মনোবৃত্তির সহিত প্রযুক্ত না হওয়ায় সেটুকুও বিশেষ কাজে লাগিতেছে না। কোনভাবে মুসলমান-সংস্পর্শে আসিলেই কাহারও আর হিন্দুসমাজে স্থান হয় না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে বিধর্মি-সমাজে আশ্রয় লইতে হয়। বিধর্মী রাজশক্তি সেই সমুদয় সুযোগই গ্রহণ করিতে লাগিল ; ফলে বাঙ্গলায় আর্য-সংস্কৃতি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া উঠিল। দীর্ঘকাল এভাবে চলিতে থাকিলে বাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা যে কাশ্মীরের অনুরূপ হইয়া উঠিত, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বাঙ্গলা যখন এমনিভাবে পতিত ও দুর্গত, তখন পতিতপাবন তাহার উদ্ধারের জন্য প্রকট হইলেন। পতিত হইলেও বাঙ্গলার অন্তরে অন্তরে মাধুর্যময়ী প্রেমভক্তির ক্ষীণধারা প্রবাহিত হইতেছিল, প্রেমের ঠাকুর তাহাতেও আকৃষ্ট হইলেন। ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনী প্রবল উচ্ছ্বাসে বিপুলাকার ধারণ করিয়া ও বহুশাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমে সমগ্র দেশ আপ্লাবিত করিল।

এই প্লাবনের মুখে দেখিতে পাই, একদিন মহাপ্রভু ঐশ্বরিকভাবে

আবিষ্ট হইয়া পার্ষদ-ভক্তগণকে বরদান করিতে চাহিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কহিলেন :

মোর এই বর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর ॥ [ভা ২।১০]

তিনি নিজের জন্য কিছুই চাহিলেন না। অদ্বৈতপ্রভুর অসীম হৃদয়-বত্তা আছে, কিন্তু তাঁহার বয়স হইয়াছে—মূর্খ-নীচ-দরিদ্রের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া প্রেম-বিতরণ করিবার মত সামর্থ্য তাঁহার দেহে নাই। স্বয়ং মহাপ্রভুও একার্যে ব্রতী হইতে পারেন না—কেননা, তিনি সন্ন্যাস করিয়া মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশান্তরী হইবেন। একাধারে হৃদয়বত্তা ও শক্তিমত্তার মূর্তবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ সেই কার্যের জন্য স্বতঃ প্ররোচিত হইলেন। প্রথমেই জগাই-মাধাই উদ্ধারে তাঁহার কৃতিত্ব সর্বসমক্ষে প্রকট হইয়া উঠিল।

এই প্লাবনের মূল উৎস শ্রীচৈতন্য ; সেই উৎস-মুখের উন্মোচনকারী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ; এবং উদ্গত প্রবাহের ধারক ও বাহক শ্রীনিত্যানন্দ।

পুরীধামে—

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দে সঙ্গে করি ॥
প্রভু বোলে—শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে।
মূর্খ নীচ দরিদ্র ভাসাব প্রেমসুখে ॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম করি।
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি ॥

তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বোল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার ॥
ভক্তিরসদাতা তুমি, তুমি সংবরিলে।
তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ॥
এতেক আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও ॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সভার মোচন ॥

নিত্যানন্দপ্রভু তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করিলেন।

আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র সেইক্ষণে।
চলিলেন গৌড়দেশে লই নিজগণে ॥ [ভা ৩।৫]

গৌড়ে আসিয়া নিত্যানন্দপ্রভু যেসকল কার্য করিয়াছিলেন, বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থা আজও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। যাহারা সমাজচ্যুত হইয়াছিল তাহাদিগকে তিনি হরিনাম দিয়া শুদ্ধ করিয়া নবীন সমাজ-বন্ধনে লইয়া আসিলেন; যাহারা বিকৃতবৌদ্ধ-মতাবলম্বী ছিল বা যাহাদের কোন ধর্ম বা জাতিই ছিল না, তাহাদিগকে নূতন সংস্কার দিয়া ভগবদ্‌ভক্ত বা 'বৈষ্ণব' জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিলেন। 'নবশাখ'-শ্রেণীর জাতিগুলি[৩] ঐসময় হইতেই সুসংস্কৃত হইয়া হিন্দুসমাজের যথাযোগ্য স্তরে বিন্যস্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। তাহাদের বৈষ্ণব-ধর্ম-নিষ্ঠাও ঐরূপ অনুমানের পরিপোষক। এইরূপে সমাজের সর্বত্র, বিশেষতঃ নিম্নস্তরে বৈষ্ণবধর্ম অনুপ্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে অভিনব প্রেরণা ও শক্তিতে পূর্ণ

৩ তিলি, মালী, গোছালী (=বারুই ও তামলি); কুমার, কামার, পাটালি (=মোদক); নাপিত, চাষা, পুটুলি (=গন্ধবণিক)।

করিয়া দিল। বৈদেশিক ধর্ম গ্রহণের হিড়িক বন্ধ হইল। অভিজাত শাক্তশ্রেণী প্রথম প্রথম বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহারই সাধনার আদর্শে বিশুদ্ধভাবে শক্তিপূজা করিতে উদ্বুদ্ধ হইল।

নিত্যানন্দপ্রভুর এই আচণ্ডালে কোলদান—এই প্রচার ও সংস্কার-পদ্ধতিই পরবর্তী কালে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ও শ্রীনরোত্তমদাসের আমলে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়াছিল।

প্রতিকূল বিধর্মী রাজার রাজত্বে, রাজশক্তির কিছুমাত্র সহায়তা না লইয়া বা না পাইয়া, কেবলমাত্র হৃদয়বত্তা ও কর্মকুশলতার বলে শ্রীনিত্যানন্দ যে কার্য সংসাধন করিয়াছিলেন, পৃথিবীর যে-কোন দেশের সমাজ-সংস্কারের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। তাঁহার আরব্ধ কার্য আজও শেষ হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কেন যে 'গৌর' অপেক্ষাও 'নিতাই'কে অধিক দয়ালু বলেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের নামোচ্চারণেরও পূর্বে সসম্ভ্রমে শ্রীনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণ করেন, তাহার রহস্য এইখানেই নিহিত বলিয়া মনে হয়। নিত্যানন্দকে বলভদ্র বা সঙ্কর্ষণের অবতার বলা হয়। তাঁহার অসাধারণ বলবত্তার সূচক কার্যাবলী এবং যুগ যুগ ধরিয়া অভিজাত শ্রেণীর অবজ্ঞাত, সংস্কারবর্জিত নরনারীকে ভগবানের দিকে আকর্ষণ করিবার শক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে বলভদ্র বা সঙ্কর্ষণ বলিয়া স্তবস্তুতি করিতে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে।

কেবল শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুই নিত্যানন্দপ্রভুর এই লোকোত্তর মহিমার স্বরূপ জানিতেন। আজীবন নিত্যমুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দচারী নিত্যানন্দের দুরবগাহ চরিত্র ক্ষীণবুদ্ধি জীব বুঝিতে ভুল করিবে—একথাও তিনি জানিতেন। সম্ভবতঃ সেই কারণেই, এবং ভুল বুঝিয়া অশ্রদ্ধা করিলে লোকেরই অকল্যাণ হইবে জানিয়া, তিনি নিত্যানন্দ-মহিমা স্বয়ং শতমুখে কীর্তন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রেমে আত্মহারা নিত্যানন্দ তাঁহার প্রাণের দেবতাকে

দেখিবার জন্য মাঝে মাঝে পুরীধামে ছুটিয়া আসিতেন। একদা ঐরূপে আসিয়া তিনি এক পুষ্পোত্থানে অবস্থিতি করিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া একাকী সেই উত্থানে আসিয়া দেখিলেন, নিত্যানন্দ ধ্যানসুখে মগ্ন আছেন। তখন—

শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
••• ••• •••
গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥

নিত্যানন্দ ধ্যান হইতে উত্থিত হইলেন এবং উভয়ে উভয়কে প্রণাম-প্রদক্ষিণ-স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন।

তবে কথোক্ষণে প্রভু যোড়হস্ত করি।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি॥
••• ••• •••
নীচজাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে সভার হইল বিমোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক-সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুর সিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥
স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
••••

অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য প্রভু কৃষ্ণ না ছাড়েন তাঁরে ॥ [ভা ৩।৮]

নিত্যানন্দপ্রভুর শূদ্রগৃহে বিলাস, আশ্রমাচারলঙ্ঘন ইত্যাদি দেখিয়া তাঁহার প্রতি সংশয়াপন্ন জনৈক বাল্যসহপাঠী ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন :

পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্মল ॥
... ...
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার ॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্বথায় মরে সর্বপুরাণ-প্রমাণ ॥
... ...
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম।
নিজদোষে সেই দুঃখ পায় জন্মজন্ম ॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলেই মরি ॥ [ভা ৩।৭]

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রায়ই নির্জন গৃহে পরস্পর মিলিত হইতেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে যেসব আলাপ-আলোচনা হইত, অন্যের তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে সহজেই ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য কথার মধ্যে, কিভাবে যুগধর্ম প্রচার ও সেই ধর্মের বাহক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিচালনা করিতে হইবে সেই বিষয়েও পরামর্শ হইত। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া

নির্জনকক্ষে স্বামী বিবেকানন্দকে কিভাবে তদীয় ধর্মসঙ্ঘ জগৎকল্যাণে পরিচালনা করিতে হইবে সেই বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

শ্রীচৈতন্যপ্রেরিত হইয়া হৃদয়বান শ্রীনিত্যানন্দ 'আচণ্ডালে কোল' দিয়া যে মহাকার্য সংসাধন করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেরিত হইয়া হৃদয়বান শ্রীবিবেকানন্দ 'শিবজ্ঞানে জীব-সেবা'র প্রবর্তন করিয়া তজ্জাতীয় মহাকার্যের সূত্রপাত করিয়াছেন। ঐ কার্যের ফল কতদিনে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা বিচার করিবার সময় এখনো আসে নাই। অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ মহান ভাব সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং অস্পৃশ্য, পতিত ও দরিদ্রের উন্নয়নে প্রযুক্ত হইয়া সামাজিক বিরাট অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছে।

জনম জনম প্রভু! দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥

—বৃন্দাবনদাস।

এই গ্রন্থ সম্বন্ধে

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন ভক্তি-ভারতী-ভাগীরথী : "ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের···দুই লীলার অন্তর্নিহিত অভিন্নত্ব সমগ্রভাবে ও নানাদিক দিয়া আস্বাদন করা এবং আস্বাদন করানো গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।···পাশাপাশি বাংলার এই দুই ভাবের ঠাকুরের জীবনের লীলারসপ্রসঙ্গ লেখকের শ্রদ্ধার অবদানে সর্বত্র সাবলীল এবং মধুর হইয়া ফুটিয়াছে। গ্রন্থকারের বর্ণনভঙ্গীটি বড় সুন্দর। ভাষার সহজগতি গভীরভাবে মনকে স্পর্শ করে। গূঢ়তত্ত্ব কথাগুলিও রসভঙ্গীতে যুক্ত করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। ভাবানুভূতির বৈচিত্র্যে উচ্ছল ও উজ্জল এমন আলোচনা পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন।"

[দেশ : ১১ই আষাঢ়, ১৩৫৬]

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য এম-এ : "উভয় অবতার-পুরুষের জীবন, সাধনা ও মত এইগুলির সামঞ্জস্য দেখাইতে গ্রন্থকার উভয়ের সম্বন্ধে প্রকাশিত প্রায় সকল গ্রন্থ হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। যেভাবে তিনি উভয়ের জীবনের ঘটনার অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে হয়।...গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তি সমান প্রশংসার যোগ্য।" [আনন্দবাজার পত্রিকা : ৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৬]

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, পিএইচ্-ডি (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) : "···শ্রীচৈতন্যের শক্তি-আরাধনা সম্বন্ধীয় এরূপ সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থকার যেরূপ অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্কের সাহায্যে মাধবেন্দ্রপুরীর শঙ্কর-সম্প্রদায়-ভুক্তি প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তাহাতে বিরুদ্ধমতাবলম্বী পণ্ডিতগণেরও মত-পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়।" [দৈনিক বসুমতী : ২২শে শ্রাবণ, ১৩৫৬]

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১। শ্রীশ্রীসারদা দেবী

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ **স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজ**: "বেশ হয়েচে, চমৎকার হয়েচে! দেখেই বোঝা যায়, কতখানি মনপ্রাণ দিয়ে কাজটি করা হয়েচে। মার আশীর্বাদ পড়বে তোমার উপর—আরও অনেকের পড়বে তার সঙ্গে। সুখে থাক, আনন্দে থাক।"

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রণেতা ডক্টর **শ্রীসুকুমার সেন** (বেতার সমালোচনা—২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭): "…এরকম well-documented জীবনীগ্রন্থ এযাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হয়েছে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা (৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৬): "…যে শ্রদ্ধা ও অনুভূতিপ্রবণ মন লইয়া এই শ্রেণীর জীবন সম্পূর্ণরূপে না হউক, যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে পাঠক সমাজের নিকট উপস্থিত করা যায়, গুরুকৃপায় গ্রন্থকার তাহার অধিকারী। তাঁহার ভাষা সংযত ও বর্ণনা-ভঙ্গী সরল। শ্রীশ্রীমার পুণ্যস্মৃতি ভক্ত গ্রন্থকার মধুকরের মত বহু ভক্তের হৃদয়পদ্ম হইতে সংগ্রহ করিয়া অপূর্ব মধুচক্র নির্মাণ করিয়াছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে খ্যাতনামা লেখক **স্বামী প্রেমেশানন্দ**: "তোমার লিখিত মায়ের জীবনী পড়িয়া আমি এত আনন্দিত হইয়াছি যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। এই গ্রন্থ মায়ের সর্বোত্তম জীবনীরূপে চিরকাল গণ্য থাকিবে। অবতার সম্বন্ধে এইরূপ গ্রন্থ লেখা তাঁর বিশেষ কৃপা ছাড়া সম্ভব হয় না।…লিখিয়া তুমি অমর হইলে।"

২। স্বামী সারদানন্দের জীবনী

"শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের অবদান বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার লিখিত 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' এবং 'বাঙ্গলার

দুই ঠাকুর'·· সুধী সমাজে সর্বত্র সমাদৃত। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্যের লেখার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ভাবকে তিনি সংযত এবং সুমধুর ভাষায় রূপ দিতে জানেন। অবান্তর উচ্ছ্বাস তাঁহার লেখায় মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, পরন্তু একটি উদারবীর্য সাক্ষাৎ-সম্পর্কে অন্তরকে স্পর্শ করে। স্বামী সারদানন্দের জীবনীতে তাঁহার সেই কৃতিত্ব সর্বতোভাবে পরিস্ফূর্ত হইয়াছে।"

—**দেশ**

"বইখানিতে গ্রন্থকারের তথ্যনিষ্ঠা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ·· প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বর্ণনা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনি মর্মস্পর্শী।···আলোচ্য মহাপুরুষের চরিত্র বর্ণনায় কোথাও অতিরঞ্জন গোঁড়ামি ও সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণতার চিহ্ন প্রকাশিত হয় নাই।· ধর্মানুরাগী ও উদারচিত্ত প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুর নিকটেই এই বইখানি শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করিবে।"

—**বিশ্ববাণী**

"এই গ্রন্থ পাঠে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি—তৃপ্ত হইয়াছি। স্বামীজীর আধ্যাত্মিক জীবন জ্ঞানকর্মভক্তির সমন্বয়ে যেমন বিস্ময়কর, গ্রন্থকারের এই চরিত্রচিত্র অঙ্কনের কৃতিত্বও তেমনি বিস্ময়কর। গ্রন্থকারের লেখনী-মুখে স্বামীজীর যে বাস্তবচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে গ্রন্থ-পাঠকালে তাহা যেন প্রত্যক্ষভাবে চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে।···গ্রন্থকার শুধু পাঠক নয়, লেখকদেরও মহাকল্যাণ সাধন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।"

—**শ্রীসুদর্শন**

৩। ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা

"বাংলা জীবনীসাহিত্যে—বিশেষভাবে জননী সারদাদেবীর প্রথম জীবনীকাররূপে লেখক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথায় তাঁর লেখনীর সরল অথচ গভীর বক্তব্য-নিবেদনের ভঙ্গীটিও পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করবে। বিভিন্ন কাহিনী স্মৃতিকথা ও পত্রাবলীর সমন্বয়ে লেখক ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিশুসুলভ সরল অন্তর, সহজ কৌতুকপ্রবণতা, দিব্য

অন্তর্দৃষ্টি, সহজাত নেতৃত্বশক্তি এবং এসব কিছুর উর্ধ্বে তাঁর লোকপাবনী অধ্যাত্মশক্তির অমেয় মহিমার সার্থক পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।"

—উদ্বোধন

"আলোচ্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় গ্রন্থকারের মহাপুরুষগণের জীবনের মর্মবাণী উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য। পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যত অধিকই হউক না কেন, তদ্দ্বারা মহাপুরুষগণের দুরবগাহ অনুভূতির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার তাহার নাগাল পাইয়াছেন।…সাধন সহায় তাঁহার বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যাহাকে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বলা হয়, তাহার অধিকারী তিনি। রাখাল মহারাজের জীবনের যেসকল গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য তাঁহার ব্যাখ্যায় পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা বিরল।"

—শ্রীসুদর্শন

"ব্রহ্মজ্ঞান এবং উপলব্ধিতে যাঁহার ব্যক্তিত্ব দুরবগাহ এবং সমুদ্র অপেক্ষাও অতলস্পর্শী তাঁহাকে সাধারণতঃ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে সকলে দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তিনি দূরের মানুষ। লীলাসুলভ আচরণে যখন তাঁহাকে আমরা পাই তখন তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। আলোচ্য গ্রন্থখানির কথাসংগ্রহে 'মহারাজ'কে আমাদের কাছে আনিয়া দিয়াছে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া সাধারণ সংসারী মানুষ মহারাজের উপদেশ ও শিক্ষা আপনাদের জীবনে ও আচরণে গ্রহণ করিতে পারিবে।

"গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে।…রামকৃষ্ণসংঘের ইতিহাস রচনার উপাদান ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।…লোকোত্তর পুরুষ হিসাবে মহারাজের স্থান কেবল সংঘে নহে, দেশের সমসাময়িক ইতিহাসে অতি উচ্চে।"

—জনসেবক

ব্রহ্মানন্দ শিষ্য, ভাষাবিৎ পণ্ডিত পি শেষাদ্রি: "How happy I am to get your valuable gift, 'Brahmananda Lilakatha', which I got last noon, I read it through at one sitting,

as it was so very charming and sweet. You have succeeded, in this most difficult work, remarkably well and you have made the almost impossible possible.… I felt entranced while reading many portions and the living presence of Sri Maharaj was evident through out. Blessed, blessed indeed are you."

৪। প্রেমানন্দ-প্রেমকথা

স্বামী নির্লেপানন্দ : "প্রেমানন্দ-প্রেমকথার ভাষা সুন্দর সাবলীল স্বচ্ছ অনবদ্য। মহাভাবময় নির্বিকল্পসম্বিৎময় ব্যক্তিত্ব সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

P. Seshadri B. A., M. L. : "Premananda-Premkatha, so very kindly and lovingly sent by you, reached me yesterday, giving me intense joy. I began to read at once and was led on and on by the excellence and exquisiteness of the treatment till I came to the last sentence. Many a time, I felt so elevated and exalted that I was blessed to read such a work; often I was so overpowered that tears rushed to the eyes. The concluding portion cannot be read by any one without deep emotion, Every sentence of the book is choice and charming....

"Your method of writing a biography is unique and seems the best. You let others speak their experiences in their own words and you remain in the background.

Generally the biographer thursts himself out at every stage and ends by praising himself. He gives his own opinion, judgment and views. On the other hand, you give abundant material, and each reader can form his own judgment. The style is also so simple, clear and vivid. The meaning is revealed at once and a picture is seen in the mind. I shall read it again and again and translate it to Bhaktas and those interested. Sri Sri Thakur has made you give devotees so much of nector. Blessed, blessed are you."